পারুলেডাঙার লাল রাখাল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন ১৩৬৪

প্রকাশিকা :
অর্চনা জানা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

কল্যাণ মজুমদারের জন্য

আধুনিক যন্ত্রে মাড়াই বিশুদ্ধ সরিষা
বীজ হইতে নিষ্কাষিত অতি উত্তম
সরিষার তৈল ভেজাল প্রমাণে
১০০১ টাকা পুরস্কার।
পিওর অয়েল মিল, পারুলেডাঙা,
শ্যামসুন্দর, বর্ধমান-ফোন : ৩১২

হ্যাণ্ডবিলখানা আগাগোড়া পড়ে প্রফুল্ল ঘোষ বললেন, এত খাঁটি সর্ষের তেল তো দেখা যায় না। তোমার বাবা মাদার ডেয়ারির মতো প্যাকেটে করে যদি বিক্রি করতেন—তাহলে সারা দেশের মানুষ এত ভাল জিনিসটা সহজেই পেতে পারতো।

বাবা তাতে রাজি নন স্যার।

কেন? কেন?

স্যার—বাবা বলে থাকেন—এত ভাল সর্ষের তেল বেশি বেশি করে তৈরি হলে বড় ব্যবসাদার এসে যাবে। সে এসে গোডাউনে জমা করবে। আকালে ছেড়ে দাম বাড়াবে। লাভ লোকসান এসে যাবে—

তোমার বাবাও তো লাভ করেন বিশ্বনাথ।

হ্যাঁ স্যার। নইলে চলবে কি করে! বাবা চান সবকিছুই অল্প লাভে ছেড়ে দেওয়া হোক; এই করেই বাবা শ্যামসুন্দরে বাজার কিনেছেন। অয়েল মিল করেছেন। সিনেমা হল। মোতিহারি তামাকের গদি—সবকিছু—

হুঁ। তুমি বলেছিলে—যাকে বলে সেলফ্‌মেড ম্যান। নাও—তেলের টিনটা ঘরে তুলে দাও। আর এই নাও দামটা—

ওটা স্যার আপনি যখন পারুলেডাঙায় যাবেন তখন নিজেই বাবার হাতে তুলে দেবেন।

তা হয় না বিশ্বনাথ। কবে যাওয়া হয়ে উঠবে তার ঠিক কি। এখনকার দাম এখনই নিয়ে রাখো।

বেশ স্যার। দিন।

প্রফুল্ল ঘোষ দুই কেজি তেলের দাম হিসেব করে বিশ্বনাথের হাতে দিলেন।

ভারতবর্ষ নানান ভগবানের দেশ। এদেশে বহু পীরের থানই জাগ্রত। এখন তো বটেই—একশো সওয়াশো বছর আগেও এদেশে অনেক পরমহংস ছিলেন! জেলায় জেলায় আজও বহু অবতার, বাবা, সিদ্ধপুরুষ, পুরুষোত্তমের কথা-কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তাঁদের নামে এখনো অনেক বটতলা, দিঘি, মেলা, স্কুল-কলেজ দাঁড়িয়ে। খবরের কাগজ, রেডিও, টি ভি-র চোখের আড়ালে এখনো ওঁদের নিয়ে—ওঁদের কথা-কাহিনী ঘিরে মাঠে মাঠে মানুষ সম্বচ্ছরে একত্র হয়—গান গায়—পুজো দেয়—আবার ভাঙা হাট থেকে ঘরে ফেরে—সংসার করে—কাঁদে—আনন্দ করে—তারপর একদিন গভীর বিশ্বাসের মাঝখানে আচমকাই মারা যায়।

এমনই এক অবতার পুরুষের নামে মঠ—সেবাব্রতের আবাসিক স্কুল-কলেজ ঘিরে হাইওয়ের গায়ে বিশাল সবুজ বসতি। বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি—মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টার—ছাত্রদের হোস্টেল, ক্লাসঘর। বর্ধমান সদর ঘাটের কৃষক সেতু পেরিয়ে দামোদরের গা ধরে এগোলেই দানবীর রাসবিহারীর নামে রাস্তার ওপরেই এই এলাহি কাণ্ড। দূর থেকে এগোতে থাকলে ওখানকার বাড়িঘরের মাথায় টি ভি-র অ্যান্টেনাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে।

সর্ষের তেলের দামটা পকেটে নিয়ে ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্র বিশ্বনাথ বুঝলো, প্রফুল্ল স্যারের কথার এদিক ওদিক হবার কোনো উপায় নেই। ফ্রিতে তেল নেবেন না। দেশভাগের আগে জেলে থাকতেই এম. এ করে স্যার বেরিয়ে আসেন। দেশের ইতিহাস মানুষটির ঠোঁটের ডগায়। ক্লাস নেবার সময় একটিও বাজে কথা বলেন না স্যার। কোনো ছেঁদো কথায় সময় দেবার মানুষ নন উনি।

স্যারের কোয়ার্টার থেকে হোস্টেল এক ফার্লং হবে না। পায়ে হেঁটে যেতে সরু চিলতে রাস্তার গায়ে দিঘি। দিঘির ওপারেই সায়ান্স থিয়েটারের দোতলা বাড়ি। এপারে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ দূরের ধানকাটা মাঠ দেখতে পেল। এখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি। সারা দেশ জুড়ে মাঠে ঘাটে এক আমুদে বাতাস। গায়ে লাগতেই ভাল লাগে। ন্যাড়া মাঠের কানাৎ ধরে যাকে বলে দিগন্ত। তার কাছাকাছি ধানকলের চিমনি। নিঃসঙ্গ তালগাছের গায়ে যাত্রার নতুন পালার পোস্টার। এইমাত্র লোমছাঁটা ভেড়ার পাল নিয়ে হাজিপুরিয়া রাখাল ডাঙাল জায়গার ঢিবিতে ন্যাড়ামাথা সমেত ভেসে উঠলো। চরাতে চরাতে বাচ্চা ছেলেটো মাস দুই বাদে কলকাতায় গিয়ে উঠবে।

এই যে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি—মঠের কলেজের কমন কিচেনে বিউলির

ডালে ভাত মেখে মেমারির কুমড়ো ফালি ভাজা দিয়ে দিব্যি দুবেলা সাপটে খাচ্ছি—আগাগোড়া স্বাদ পাচ্ছি তো। আমি হাঁটলে আরাম পাই। ঘুমোলেও পাই। এই আরাম, আস্বাদ, আনন্দ কোত্থেকে আসে?

এই তো প্রজ্ঞানেত্র স্বামী আসছেন। ওঁর কাছেই ব্যাপারটা জানতে চাইবে ঠিক করলো বিশ্বনাথ।

বাইরে থেকে পড়াতে এসে এখানকার কোয়ার্টারে থেকে যাওয়া প্রফুল্ল স্যার যেমন আছেন—আবার মঠ মিশনে এসে সাধু হয়ে যাওয়া প্রজ্ঞানেত্রর মতো মহারাজরাও আছেন—যাঁরা কিনা স্বামীজী হয়ে এই শিক্ষাসদনকে সামনে রাখেন—কিছুতেই বেলাইন হতে দেন না।

ঈশ্বর কি আরাম? ঈশ্বর কি আস্বাদ? কিছুই বুঝতে পারি না মহারাজ।

ত্রিশ বত্রিশ বছরের প্রজ্ঞানেত্র মহারাজ ভ্রূ কুঁচকে বিশ্বনাথের মুখে তাকালেন। তোমার না আর তিন মাস পরে ফাইনাল? এখন ওসব কিছুদিন না বুঝলেও চলবে বিশ্বনাথ—

থমকে গিয়ে বিশ্বনাথ বললো, হ্যাঁ স্যার। নিজের মনে মনে বললো, এর চেয়ে আর পাঁচটা ছেলের মতো বলতে পারতো নেত্তরদা—রিডিকিউলের বাংলা কি? তাতে খুশিই হতেন প্রজ্ঞানেত্র!

স্বামীজী বলে গেছেন--মন দিয়ে ফুটবল খেলতে। মনে আছে?

পড়েছি স্যার—

ঈশ্বর কি?—এই নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করে দিলেন তিনি। বলে দিলেন—মন দিয়ে আগে নিজের কাজ করতে!

লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল বিশ্বনাথের।

প্রজ্ঞানেত্র মহারাজ এবার বললেন, গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন—এখন কিছুদিন ঈশ্বর আছেন কী নেই—এই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। টেস্ট হয়ে গেছে--এখন তো সারাদিন পড়বে। কোশ্চেন আনসার লিখে লিখে তৈরি হবে।

হ্যাঁ স্যার—বলেই প্রায় ছুটে হোস্টেলে নিজের সিটে চলে এল বিশ্বনাথ। সে এই শিক্ষাসদনে একদম ছেলেবেলা থেকে আছে। পারুলেডাঙা থেকে তাকে প্রায় কোলে করে এনে তার বাবা ভর্তি করে দিয়েছিল। তা তো দশ এগারো বছর আগের কথা। ভর্তি হয়েছিল ফাইভে। এখন সে গ্র্যাজুয়েট হতে চলেছে। বি. এস-সি ফাইনাল সামনে।

এখানকার দিঘির জল, ক্লাসঘরের ব্ল্যাকবোর্ড, কলমের আমগাছের ছায়া

সবই বিশ্বনাথের নখদর্পণে। সে পারুলেডাঙার মহেশ্বর মাইতির ছেলে বিশ্বনাথ মাইতি। থানা শ্যামসুন্দর, মৌজা শ্যামসুন্দরবাটি, গ্রাম বা গঞ্জ পারুলেডাঙায় সামান্য সন্তান। শ্যামসুন্দর বাজারে লোকে মসকরা করে বলে—পিওর অয়েল মাইতির একমাত্র সন্তান বিশ্বনাথ মাইতি। সেসব কথা থেকেই তার কানে সটান কথাটা উঠে এসেছে।

কোথায় স্বামীজী—আর কোথায় সে!

কোথায় গৌতম বুদ্ধ—আর কোথায় সে!

এই বর্ধমানের গ্রামদেশের মানুষ সে। পিওর অয়েল মাইতির ব্যাটা। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা কি তাকে মানায়?—না মুখ ফুটে তার বলতে আছে! নিজের চেহারাটাই নিজের মনে ভেসে উঠলো বিশ্বনাথের। কালো-লিকলিকে। গলার কণ্ঠমণি সব সময় জেগে আছে। মাথায় উস্কখুস্ক চুল। দুই ভ্রূর মাঝখানে দাঁড়ির মতো একটা শিরা জেগে থাকে। তা কি ভোর রাতে অমন করে ধ্যানে বসে থাকে বলে একটা শিরা সারাদিন অমন কপালে জেগে দাঁড়িয়ে থাকে?

প্রজ্ঞানেত্রদা তো বলতে পারতেন—তোমার জিজ্ঞাসার কথা বড় মহরাজকে বলো বিশ্বনাথ।

তা নয়—সিধে স্বামীজী দেখিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়—তারপর আবার গৌতম বুদ্ধ? মহেশ মাইতির ব্যাটা বিশে মাইতি আবার ভগবানের কথা বলবি? বেশ শিক্ষা হয়ে গেল যা হোক।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—কালো কুচকুচে একটা পিচরাস্তা ধানকাটা মাঠের পর মাঠ চিরে দূরে ধোঁয়ায় মিশে গেছে। রোদ এখন চড়া। লোমছাঁটা ভেড়ার পাল নিয়ে হাজিপুরের চরানী ছেলেটা অনেকটা দূরে এখন। আজ সারারাত ও আকাশের শুকতারা দেখে কলকাতার দিকে এগোবে। ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে বিশ্বনাথ। মাঘ মাসে হাজিপুর থেকে বেরোয়। পথে হাতিয়ায় পশম-কলে ভেড়াদের গায়ের লোম জমা দিয়ে কলকাতার কসাইদের জন্যে লম্বা পথ পাড়ি দেয়। দিনে দিনে যতটা পারে এগোয়। সন্ধ্যে হলে চরানী ছেলেটা ভেড়াদের এক জায়গায় জড়ো করে তাদের গায়ের গরমের ভেতর শুয়ে পড়ে লম্বা ঘুম মারে। নিশুতি রাতে জেগে উঠে চাঁদের আলোয় আবার চলতে শুরু করে। আকাশের তারা দেখে। দূরে ঘুমন্ত বসতির গাঁ ঘিরে ছড়িয়ে পড়া আলোর ছটা দেখে। দিনে দিনে তো অত হাঁটা যায় না। মাস তিনেকের এই যাত্রাপথে হাজিপুরিয়া চরানী কিশোর কী করে যে এক একটা ভেড়ার এক এক রকম নাম দিয়ে ফেলে—সেই নামে

তাকে যখন—থমকে দাঁড়িয়ে ভেড়া সাড়াও দেয়।

ও হামারি বুধোনিয়া—ও ঢেড়াইয়ে! আবো। আব—

অমনি বুধোনিয়া, ঢেড়াই, কাঞ্চু নামের সব ভেড়া দাঁড়িয়ে পড়ে। ছুটিতে পাকুলেডাঙায় থাকতে এসব দেখেছে বিশ্বনাথ। আর ক'দিন পরেই তো কলকাতার কসাইঘরে গিয়ে যে যার মতো উঠবে। তবু পথ-চলতি ভালবাসার এত টান? ভেবে পায় না বিশ্বনাথ। কোত্থেকে এত ভালবাসা আসে পশুর ভেতরে। চরানী ছোকরার পাচনের বাড়ি খেতে খেতে ওরা ন্যাড়া মাঠে সদ্য গজানো ঘাসের মাথা খুঁজতে খুঁজতে তো পথ ভাঙে। ওরই ভেতর আদরের ডাকটা ঠিক চিনতে পারে।

চড়া রোদে কালো কুচকুচে পিচরাস্তা দিয়ে একটা নাকবোঁচা লরি চলে গেল পাকুলেডাঙার দিকে। মাইল কুড়ি গেলে শ্যামসুন্দর থানা পড়বে। থানার সামনেই কনস্টেবল দাদাদের ভলিবল খেলার মাঠ। মাঠের গা দিয়ে পঞ্চায়েতের বানানো নতুন রাস্তা। সিধে চলে গেছে মৌজা শ্যামসুন্দরবাটি। সেখান থেকে গ্রাম বা গঞ্জ পাকুলেডাঙা আধক্রোশ রাস্তাও নয়।

যেখানে গাঁ পাকুলেডাঙা—সেখানেই স্টেশন পাকুলেডাঙা। বাঁকুড়া-দামোদর লাইট রেলের ছোট গাড়ি নিত্যদিন দুবেলা এই স্টেশন পাকুলে-ডাঙায় হাঁসফাঁস করতে করতে ঢোকে। পাকুলেডাঙা হয়ে গাড়ি চলে যায় দামোদরের ওপারে—ছোট্ট পোল পেরিয়ে কু-ঝিক-ঝিক দিতে দিতে। পুরনো রেললাইন ধরে দু'ধারে বুড়ো বুড়ো বুনো তেঁতুলের মোটা গুঁড়ির গাছ। তেঁতুল পাকলে আকাশের পাখি অব্দি বসে না। খেলেই মাথা ঘুরে পড়তে হবে।

এ মা! চোখে জল এল কখন? ভাগ্যিস হোস্টেল এখন ফাঁকা। বিশ্বনাথ মাইতি তার চোখের জল মুছে ফেললো একা একা। কেন যে তেঁতুলগাছের ছায়ায় ঢাকা ছোট রেলের লাইন চোখে ভাসলেই সেখানে জলের ফোঁটা এসে দাঁড়ায়? হাজিপুরিয়া রাখাল নিশুতি রাতে আকাশের তারা দেখে ভেড়ার পাল নিয়ে আবছা মতো ধানকাটা ন্যাড়া মাঠ ভাঙছে—এই ছবিটাও চোখে ভাসলে কেন যে সেখানে দু' ফোঁটা জল এসে দাঁড়ায়? ভেবেই পেল না বিশ্বনাথ। বেঁচে থাকার—জেগে থাকার··· বুঝতে পারার এই যে জীবন—এর তো একটা আলাদা স্বাদ থাকবেই। জানলা দিয়ে তরতরন্ত দুপুরের দিকে তাকিয়ে সে এই মাত্র টের পেল পৃথিবীটা যত-খানি স্বাদের ততখানিই বড়সড়। কত বড় ফাঁকা মাঠ—দিগন্ত অব্দি গড়িয়ে যাওয়া প্রান্তর। কী অসম্ভব নির্জন একাকী পিচরাস্তা! হাজিপুরিয়ার

রাখাল—তার ভেড়ার পাল—কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না এখন।

ধপ করে নিজের সিঙ্গিল সিটের বিছানায় বসে পড়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো বিশ্বনাথ। কান্নার কাঁপুনীর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের দিক থেকে একটা ঢেউ শরীরের ভেতর সব ভাসিয়ে দিয়ে নাভি অব্দি উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের দুই ঠোঁট যাকে বলে বিস্ফারিত। চোখেরও দুই কোণ ফেটে গেল যেন। উঃ! এ যে ভয়ঙ্কর আনন্দ! চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে। মুখের দুই কষাড় খুলে গিয়ে এক অদ্ভুত হাসি বেরিয়ে পড়লো বিশ্বনাথের। সে কিসের ভেতর তলিয়ে যেতে লাগলো। হাসি, বানের জল, কান্না সব মিলে মিশে একাকার।

ভরদুপুরে বিশ্বনাথ মাইতির ফাঁকা হোস্টেল ঘরে ছায়া নামলো। খাটের পাশের দেওয়ালটা ধ্বসে পড়ছে। খাটের ডান দিকের পায়া গুটিয়ে সবসুদ্ধ নিয়ে কাৎ হয়ে পড়লো। কোত্থেকে বাঁধভাঙা জল তেড়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ দেখলো, ভাদ্র মাসের পড়ন্ত বেলায় সে আর প্রফুল্ল স্যার বিষ্ণুপুর শহরের বাইরে লাল কাঁকুরে মাটির পথ ধরে কোথায় চলেছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। দু'ধারে শালগাছের পাতাগুলো ঘন কালো। তাদের ফাঁক দিয়ে শালফুলের গন্ধের ঝাঁঝ নাকে এসে ধাক্কা খেল। ভিজে। স্নিগ্ধ।

স্যার বললেন, আরেকটু হাঁটলেই ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবার জন্মস্থান। এই গাঁয়েরই বিরাট সাধক ছিলেন। হাঁটতে পারবে তো?

খুব পারবো স্যার।

এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের গাঢ় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সে যেন কতকাল ধরে তারই বিছানার কিনারায় ঘুমিয়ে ছিল। এই মাত্র সেই ঘুম ভাঙলো। আমার কি হয়েছিল?

তখন তখনই তার সব মনে পড়ে গেল। গত বছর প্রফুল্ল স্যারের সঙ্গে ফিজিক্স অনার্সের তারা আটজন এক্সকারসনে গিয়েছিল। বিষ্ণুপুরের এক-দিকে জয়পুরের জঙ্গল। আরেক দিকে লালমাটির রাস্তা ধরে ভিজে শালফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবার গাঁয়ে যাওয়া। সে গাঁয়ে অনেকেরই জমিজায়গা নেই। ক্ষেতমজুর—জাতে লোহার। ওরা বিনীত, পরিশ্রমী—বড়সড় চেহারার মানুষ। চোখগুলো গভীর আর কালো। প্রফুল্ল স্যার বলেছিলেন, দেখেছো বিশ্বনাথ—সাধক মানুষের জায়গা তো—মানুষগুলো পর্যন্ত অন্যরকম।

কথাটা খবই খাঁটি। একবার সরকারী বাসে কলকাতা যাওয়ার পথে কাঠদুপুরে বিশ্বনাথ কোতুলপুরে নেমে পড়েছিল। গাছের পাতার এপিঠ

ওপিঠ ঘন সবুজ। পথ চলতে ধুলোও যে অন্যরকম। তখনো সে জানতো না—এই পথ দিয়েই গদাধর সারদাকে বিয়ে করে ঘরে ফেরেন। এখন সেখানে হাইওয়ে দিয়ে স্টেট বাস ছোটে, বি. ডি. ও অফিস, মাঠে মাঠে স্যালোর বটবট। তবু যে আলাদা—পরিষ্কার বোঝা যায়।

আমার এ কি হলো? এ কথা মনে আসতেই উনিশ কুড়ির বিশ্বনাথ এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকের জানলার কপাট ভেজিয়ে দিল।

কেননা, তার ভয় হচ্ছিল—এখুনি হয়তো জানলা দিয়ে দেখতে পাবে—থানা শ্যামসুন্দরের দিক থেকে একে একে হেঁটে আসছেন—গৌতম বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর বর্ধমান, চৈতন্যদেব, নিগমানন্দ পরমহংস, রামকৃষ্ণদেব—যে যাঁর নিজের ভাবে বিভোর দশায়। উর্ধ্ববাহু। মুখে হাসি।

ভেজানো জানলার কপাটে বিশ্বনাথের হাতখানা কেঁপে উঠলো।

থানা শ্যামসুন্দর। মৌজা শ্যামসুন্দরবাটি। গ্রাম বা গঞ্জ বা লাইট রেলের স্টেশন পারুলেডাঙা। দামোদরের মতিগতি বুঝে পারুলেডাঙার যেদিকটায় ষাট সত্তর বছর আগে লাইট রেলের পাটি পড়েছিল—তার ঠিক উল্টোদিকেই সিধে সরল রাস্তা ছুটে গিয়ে বর্ধমান সদরে হাজির।

এই ষাট সত্তর বছরে পৃথিবী অনেক বদলে গেল। দামোদর বসে এসেছে। ম্যালেরিয়ার বর্ধমানে জমি এখন অনেক দিন হলো দু'ফসলী। একসময়কার লাইট রেলের দাপাদাপি আর কানেই আসে না। বহুকাল হলো বড় লাইন ধরেই যা-কিছু নগর বসেছে—বসতি জেগেছে। গঞ্জ গড়ে উঠেছে।

তাই বলে পারুলেডাঙাও বসে থাকেনি। সে বড় লাইন পায়নি ঠিকই—কিন্তু জেলার যে দিকটা বাঁকুড়া আর হুগলীর গলাগলি—সেসব জায়গার গভীর গহন থেকে ফলফলারি, কালীযাত্রা, বুড়োশিব, নীলষষ্ঠীর ব্রতকথা এ তল্লাটের জন্যে ঠিক টেনে এনেছে পারুলেডাঙা। হুগলীর চাঁপাডাঙা থেকে কবেই এনেছে ইলেকট্রিক। মানুষ তো আর বসে থাকে না। বংশ বাড়ায়। এক এক মানুষ এক এক রকম। তারা মিলেমিশে গিয়ে পারুলেডাঙার জন্যে সর্বদাই কোনো না কোনো রগড় রেডি করে রাখে। তাই লাইট রেলের এই স্টেশনটা কখনোই তেতো যায় না।

একদিন এই পারুলেডাঙার মহেশ্বর মাইতি ছোটগাড়ি ধরে বাঁকুড়া চলে যেতো। তখন তার বর্ধমানের দিকে ফিরে তাকাবারও সময় থাকতো না।

অল্প চেনা—কম জানা সব গাঁ-গঞ্জের ভেতর দিয়ে ছোটগাড়ি ছুটে যেত। যেখানে যা দরকার তাই নিয়ে গিয়ে হাজির হতো মহেশ্বর মাইতি। চিরুনী, নকুলদানা, দুই পয়সার আলতা, ফরগেট মি নট। কত কি!

সেই ইঞ্জিন দু'খানাই আজও ধড়ফড় করে গাড়ি লেজে বেঁধে নিয়ে ছোট লাইনের ওপর ঘোরাফেরা করে। ওদের দেখলেই চিনতে পারে মহেশ্বর মাইতি। এখন তো প্ল্যাটফর্মে বাঁদরলাঠি ফুলঅলা গাছটা পোজ দিয়ে দাঁড়ানো। আগে কটা বুনো তেঁতুল ছাড়া কোনো গাছই ছিল না আশেপাশে। যেমন ছিল না আজকের মতো লেবেল ক্রসিংয়ের দু'পাশ ঘিরে গণ্ডা দুয়েক এম বি. বি. এস-এর চেম্বার। ইটখোলার দিকে দুর্গা টকিজ। কিম্বা শো-কেস সাজানো কাপড়ের দোকান সাবিত্রী বস্ত্রালয়। সুফলা সাহের কারবার—আর বরদা ঔষধালয়।

তেতলার বড় ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে মহেশ্বরের ঘুম আসছিল না। দুপুরের ভাত-ঘুম কোনোদিন তার ধাতে নেই। রোদটা পড়ে এলেই সে সাইকেল নিয়ে বেরোবে। বোরোধান ফেলা আছে লাইনের ওপারে চোদ্দ বিঘেয়। কেমন শিষ এল দেখতে হবে। ছড়া পড়ল কিরকম। দুর্গা টকিজ তারই। প্রোজেক্টরের কারবন পাল্টানো দরকার। দরকার আরও হরেক কাজ। জনস্টন পাম্পসেটের একটা ডিজেল ফিলটার আনাতে হবে। মাথার কাছেই ফোন। রিসিভার তুলে গুসকরায় ডিস্ট্রিবিউটরের দোকানে ফোন করল। লাইন পেল না।

এখান থেকে শুয়ে শুয়েই মহেশ্বর মাইতি লেভেলক্রসিংয়ের লাল পাইপটা দেখতে পায়। ওখানেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সে। তখন তার পায়ে থাকত ঘুঙুর। বিশ্বনাথের বয়সী ছিল। ট্রেনে অ্যাংলো চেকার। টিকিট ছিল না। এক আনার একখানা টিকিট। চেকারের ভয়ে লাফ দিয়েছিল মহেশ্বর। পায়ের ঘুঙুরের দানা ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল রেল লাইনের পাশের ঘাসে। পিঠের নকুলদানারও সেই দশা।

ওসব কথা এখানে এখন সবাই ভুলে গেছে। এখন সে এখানকার অয়েল মিল মাইতি! বেশ যা হোক বানিয়েছে কথাটা। শুনলে ভালই লাগে মহেশ্বরের। তবে সামনাসামনি কেউ সেকথা অবশ্য বলে না। ভয় পায় তাকে। সে কিন্তু কাউকে কখনো কোনো কথা বলে না। তবু ভয় পায় লোকে তাকে। পয়সা হলে এই এক বিপদ।

তেতলার দেয়ালগুলোয় টাকা-পয়সা, কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার,

দলিলের সব লুকোছাপা আলমারি। একখানা ঘর বিশ্বনাথের মা যেমন রেখে চলে গেছে—তেমনটি সাজানো পড়ে আছে। বছরে একদিন সে-ঘরে খুব আলো দেওয়া হয়। ফুলের মালা আসে। ধূপ।

দোতলা জুড়ে তিনটে ভাইয়ের আলাদা আলাদা সংসার। ভাইরা যে যার ঘরে এখন সপরিবারে ভাত-ঘুমে। লম্বা টানা বারান্দাগুলোও এখন অসাড়—ফাঁকা। এমন দশাসই সব বারান্দা কি করে বানালাম? এখন তো এক বস্তা সিমেন্টই পঁচাত্তর। এক এক বারান্দায় শুধু সিমেন্টেরই শ্রাদ্ধ হয়েছে।

একতলায় সর্ষের গোডাউন, ইলেকট্রিক ঘানির মডার্ন তেলকল, তিন তিনখানা লরির গ্যারেজ। এছাড়া সিমেন্ট সুরকির ইমারতী মালের পাকা গোডাউন। বাড়ি থেকে আলাদা করে গরুর গোহাল, ধানের গোলা, একখানা ঝকমকে অ্যামবাসাডার গাড়ির গ্যারেজ। পাকুলেডাঙার রাস্তা দিয়ে যাবার সময় লোকজন তাকে দূর থেকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—ওই তো পিওর অয়েল মাইতি। কিংবা মাইতি মশায়।

ও কে? কে বসে ওখানে?

আমি মহেশ্বর—

তাকে নাম ধরে ডাকার মতো লোক বড় একটা নেই এখন পাকুলেডাঙায়।

ওঃ! নীলাম্বর? তা কি মনে করে?

জানোই তো টাকার দরকার পড়লে আসি তোমার কাছে। আর কার কাছে যাবো পাকুলেডাঙায়?

নীলাম্বর, তুমি তো জানো—ওই বাগানটা লিখে না দিলে আমি আর তোমায় কোনো টাকা দিতে পারবো না।

ও বাগানটা নিও না মহেশ্বর। ওটা বাবার বড় শখের বাগান ছিল।

তিনি তো আর নেই। প্রায় সবই উড়িয়ে দিয়ে চলে গেছেন। তুমি তাঁর স্মৃতি বয়ে বেড়াবে কেন শুধু শুধু?

মহেশ্বর টান টান কালো রঙের মানুষ। দাঁড়াবার ভঙ্গী তাগড়া। আর নীলাম্বর ভাঙাচোরা। তবে দেখার মতো ফরসা। সেই সঙ্গে মাথার চুলগুলো একদম সাদা।

এখন তেলকল ফাঁকা। ভেজাল প্রমাণে ১০০১ টাকা পুরস্কারের সাইন-বোর্ডখানা রাস্তার দিকে মুখ করে সিঁড়িতে ঠেসান দিয়ে নামানো। কড়কড়ে রোদে এখন রাস্তাতেও লোক নেই কোনো।

মহেশ্বর মাইতি হাসি হাসি মুখে বলল, ভাখো নীলাম্বর—আমি আর তুমি

পাকুলেডাঙার পাঠশালায় পড়তে গিয়ে ফেলো ছিলাম। এখন তোমায় দেখলে আমার বাবা মনে হবে—

সে তো হবেই মহেশ্বর। আমি তো কোনোদিন নিয়মে থাকিনি। বাবা জমিদারের ছেলে—তায় নাটুকে মানুষ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকে বাপকে দেখেছি নামী মানুষের সঙ্গে উঠতে বসতে। শেষে সিনেমা করে দেশসুদ্ধ লোকের মুখে রাতারাতি হিরো হলেন। কত হিরোইন আসতো ওই বাগানে —তুমি তো দেখেছো মহেশ্বর—

তা আর দেখিনি। তোমার সঙ্গে গিয়ে কত স্টার দেখেছি স্বচক্ষে।

তুমি নিজের পায়ে দাঁড়ালে ব্যবসা করে। আমি বাপের পয়সায় অল্প বয়সেই ভেসে গেলাম। শরীর গেল। বয়স গেল। বিয়েও করলাম।

ভাগ্যিস বাবা হওনি নীলাম্বর!

সেকথা তুমি বলতে পারো। এই তো এতখানি বেলা হলো—ঘরে ফিরে দেখবো—গিন্নি একা আমার পথ চেয়ে বসে আছে। এখন মনে হয়—একটা ছেলে থাকলে ভাল হতো।

হতো কি? খাওয়াতে কি?

তোমায় তো সব দিয়েছে ভগবান। রামের মতো ছেলে। লক্ষ্মণের মতো সব ভাই। দাও না আমায় ছত্রিশশো টাকা। কাবলেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে। এ তোমার হাতের ময়লা। কিন্তু আমার কাছে কতখানি—

কতখানি?

পুরনো দেনা শুধবো। তারপর বাকিটা—

বাকিটায় রেস খেলবে কলকাতায় গিয়ে—

তা দু'পাঁচ টাকায় খেলতে পারি। দাও না ভাই—তোমার কাছে তো ও টাকা কিছুই নয়।

টাকার একটা নিয়ম আছে ভাই। সে নিয়ম ভাঙি কি করে? লিখে দাও—

ওটা লিখে দিলে কোথায় দাঁড়াবো মহেশ্বর? ধান উঠলে একটু একটু করে শুধে দেবো।

বেশ তো। কথা দিচ্ছি—জীবনস্বত্ব তোমার থাকবে। যতদিন বাঁচবে ও-বাগানে আমি হাত দেবো না নীলাম্বর। তারপর তোমরা বুড়োবুড়ি চলে গেলে তখন না হয় দেখা যাবে।

সে কি কেউ বলতে পারে মহেশ্বর! ধরো যদি তুমিই আগে চলে গেলে।

সে তো আমার ভাবনা নীলাম্বর। এখন তো সূর্য ডোবে দেরিতে। থেকো বাগানে। আমি যাবো। অনেকদিন তো যাইনি।

কড়কড়ে রোদের ভেতর সাদা রঙের নীলাম্বর রাস্তায় নেমে গেল। পায়ের কেডস্‌ও সাদা—তবে মেঠো ধুলোয় ময়লা।

খুব তৃপ্তির একটা বড় উদ্গার দিয়ে একসেরি গ্লাসের পুরো জল খেয়ে ফেলল মহেশ্বর। বিকেলের গাড়িটা টানতে টানতে লাইট ইঞ্জিন ঢুকছে পাকুলেডাঙায়। বর্ধমানের এদিকটা ধেনো। ক্যানেল হওয়ায় সম্বচ্ছরই মাঠে কাজ লেগে আছে। এই গাড়িতেই বাঁকুড়ার দিক থেকে দুমকা, মেজিয়া সালতোড়ের কামলারা কাজ খুঁজতে আসে। আর এই গাড়িতেই সারা বুকে সেফ্‌টিপিনের মালা ঝুলিয়ে ফিরিওলা মহেশ মাইতি একদিন ফিরে আসতো। পাকুলেডাঙা থেকে বেরোতো ভোরের সেই ফার্স্ট গাড়িতে। সে একটা দিন গেছে তখন তার। ভাইগুলো তখন ছোটো ছোটো। ইন্দাস পৌঁছে তবে জলখাবার খেত মহেশ্বর। পথে সেহেরাবাজার, ডোরকোনা—বসন্তচণ্ডী, বাওয়ালি।

দোতলার বন্ধ দরজাগুলোয় তাকিয়ে মহেশ্বর মাইতি নিজে নিজেই বললো, আচ্ছা, ওরা কি আজ ঘুম থেকে উঠবে না? বিকেলের গাড়ি এসে চলে গেল। এখুনি শ্যামসুন্দর থানা ফেলে বাস ছুটবে বর্ধমান। দক্ষিণ বাঁকড়োর লোকজনের সদর বর্ধমানে যাবার এইটেই রাস্তা। লাইট রেল—তারপর বাস।

বেলাবেলি গিয়ে বাগানে হাজির হলো মহেশ্বর মাইতি। পাকুলেডাঙার সদর রাস্তার গায়ে এক চাপে এমন বারো বিঘের বাগান কেউ ছাড়ে! চার-দিকে আম-কাঁঠাল-লিচুর বাছাই সব গাছ। মাঝখানে বিঘে তিনেকের দিঘি। তাতে বাঁধানো ঘাট। ওই ঘাটে বসে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা ছবির হিরো সত্যন্তর মুখুজ্যে ইয়ার-বকসি নিয়ে আড্ডা দিত। নীলুর আপন বাপ। স্বচক্ষে দেখেছে মহেশ্বর। তখন সে বালক। ওই তো সেই কাঠের বাড়িখানা ভেঙে পড়েছে। সত্যন্তর মুখুজ্যের শখের বাংলো। এখন নিশ্চয় নীলাম্বরের ডেরা। ঘরের গায়েই বোরোধান দিয়েছে নীলু। পেকে একদম হলুদ।

রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই বাস যাচ্ছে। একটা পেঁপেগাছের পাশে দাঁড়ানো নীলাম্বর মুখুজ্যে বললো, এক চাপে বারো বিঘের এই দাগ বাবার নিজের খরিদা সম্পত্তি। তখন সারাদেশে নাম ছড়িয়েছে। ওই ঘাটটায় বসে চাঁদনী রাতে একদিন কঙ্কাবতী গান গেয়েছিলেন। চন্দ্রাবতী একদিন বাবার মান ভাঙাতে

এসেছিলেন—বাবা তখন ওই ঘাটে বসে ছিপ ফেলছেন—স্টুডিওতে যাননি মার ওপর রাগ করে—

সে তো আমি সব জানি। আমাদেরও তো কিছু কিছু দেখা।

আসতেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, জোহরা বাঈ আগ্রাওয়ালী এসেছিলেন একবার।

চাঁদের হাট বসে যেত তখন ওখানে।

কত গান শুনেছি বাবার পাশে বসে। সায়গল তখন সিঙ্গিং স্টার। মলিনাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন একদিন বিকেলে। মাটির ঘরে যে পোশাক—একেবারে সেই সাজগোজ করে মলিনা এসেছিলেন। বেশি রাত অব্দি সায়গল গাইলেন। এখনো কানে বাজে মহেশ্বর। তারপর বাংলোর বারান্দায় বসে ডিনার খেলেন সবাই—জোছোনা কথাটা ঠিক ঠিক বলতে পারতেন না সায়গল। বাবা কয়েকবার দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

চল নীলাম্বর—বাংলোর কি দশা করেছো দেখি।

ভাঙাচোরা কাঠ। পাটাতনের বেশ কয়েকখানা মিশিং। বিকেল-বেলাতেই একটা নিভু হেরিকেন ঘরে বসানো।

তোমার গিন্নি কোথায়?

সুন্নি শাক তুলছে বোধহয় বাগানে। পাছে অন্ধকারে আছাড় খাই—তাই দিনে দিনে হেরিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

মহেশ্বর জানে সুন্নি শাক মানুষ কখন নিজে থেকে তোলে। ঘরে যখন আর কিছু থাকে না—তখন এই শাকের বড়া—বাটা সবই চলে ভাতের পাতে। মুখে বলল, এ কি ঘরের দশা! আরও তো জায়গা ছিল।

সেসব ঘর অনেকদিন খোলা হয় না। মানুষ তো দু'জন। তায় কাঠে উই ধরছে। ছাখো—বাঁশের মাচা মতো করে দিয়েছি। বসে ছাখো।

মহেশ্বর বসতেই মচমচ করে উঠলো। জানলাটা খোল নীলাম্বর।

একখানা লাঠি বাড়িয়ে নীলাম্বর জানলার কপাট দু'খানা খুলে দিল। মহেশ্বর দেখলো—এখানে নীলাম্বর আর তার গিন্নি শুলে মাথার নিচেই জানলার ওপাশে পাকা ধান হলুদ হয়ে ঝুলে পড়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে নীলাম্বর বললো, ওই বিঘে দুইয়ে রত্না দিয়েছিলাম। এমন ফলবে ভাবিনি। এই বর্ষায় বুড়োবুড়ির ওইটুকুই ভরসা। ক'দিন আগে ঘুম ভেঙে যেতে মাথার কাছের খোলা জানলায় তাকিয়ে দেখি—আকাশ থেকে নিশুতি রাতের হলুদ চাঁদ আমারই বাগানে নেমে এসেছে।

জমি থেকে মোটে হাত তিনেক উঁচুতে। অত বড় চাঁদ আগে কখনো দেখিনি মহেশ্বর। মনে হলো—হলুদ আলোয় হলুদ ধানের ছড়ায় আগুন ধরে যাবে। লাফ দিয়ে উঠলাম—

বড্ড গরম নীলাম্বর এখানে। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

বাইরে মহেশ্বরের পাশে এসে দাঁড়ালো নীলাম্বর। দাঁড়িয়েই বললো, এক এক সময় মনে হয়—এই পাকা ধানই আমার ছেলে। সহায় বলতে—সম্বল বলতে—কে আর দেখবে আমাদের—

সেই ধান দিয়ে তো আমায় শুধতে চাইছিলে—ও ধান ক'টা গেলে কি খাবে?

প্রায় অন্ধকার থেকে ঘোমটা দেওয়া একজন মেয়েমানুষ বললো, কাবলেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে আপনার বন্ধুকে। ধান তো বছর বছর হয়। তাই দিয়েই শুধবো।

ধানসেদ্ধ-ভানাইয়ের কেঠো মেয়েমানুষের মতো দেখতে—হাতে শাকের পাজি দেখে চিনলো মহেশ্বর ঝুপ করে এবার সন্ধ্যে নামবে। পাকুলেডাঙায় স্ট্রীট লাইট এখনো হয়নি।

মহেশ্বরের গায়ে ঘাম দিয়েছে। সেই সঙ্গে সারাদিনের চড়া রোদের গুমোট। সে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। পারলো না।

আমার গোহাল দেখে যাও মহেশ্বর।

বড্ড গরম ভাই। আরেকদিন দেখবো। গোহাল করেছো নাকি? গরু পেলে কোত্থেকে?

শ্রাদ্ধশান্তির ডাক পাই তো আজকাল। তাছাড়া যারা এখনো ভোলেনি—তারা বৃষোৎসর্গের পার্টি পাঠিয়ে দেয়। তা থেকেই কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই গোহাল।

শেষে শুধু ষাঁড় দিয়ে গোহাল বানালে নীলাম্বর!

আরে না না। আগে ভাখোই না। বকনাও তো কেউ কেউ দিয়েছে—আমার এখানে এসে তারা বছর বছর বংশে বেড়ে তবে না এই গোহাল মহেশ্বর—

নীলাম্বরের গিন্নি হেরিকেনটা এগিয়ে দিয়ে গেল। গোলপাতার পচাধচা ঝুরঝুরু ছাদ। নিচে ইটের পিলার—নুয়ে-পড়া বাঁশের আড়া। গোহালের ভেতরটা অন্ধকার। সামনের দিকে গোটা তিনেক গাই গরু দাঁড়িয়ে। তার ভেতর একটাকে মহেশ্বরের বিলিতি বিলিতি লাগলো

সেটাকে দেখিয়ে নীলাম্বর মুখুজ্যে বললো, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ওটার ওপর বাবা ভর হন।

কে ?

সত্যভর মুখুজ্যে। বাংলা সিনেমার একসময়কার এক নম্বর নায়ক। পাশের দুটোর ওপর ভর হন পিসিমা আর রাঙাকাকা।

তাঁরা তো অনেকদিন হলো মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন !

দুনিয়ার মায়া বড় শক্ত দড়ি মহেশ্বর !

ওঁরাই যে আসেন কী করে টের পাও ?

নিজেদের ভেতর কথা বলেন যে—

কোন ভাষায় নীলু ?

কেন ? গরুর ভাষায়। হাম্বায় তখন তেজ বেড়ে যায়। ওই গাইটা আবার বাবার মতো গলাখাকারি দেয় মহেশ্বর।

ফিরে দাঁড়ালো মহেশ্বর মাইতি। আমি চললাম নীলু।

এই গাই তিনটে রেখে তো টাকাটা দিতে পারো ভাই।

জল-ঝড়-রোদ বোঝার জন্যে যেমন এই শরীরটা—তেমনি ঈশ্বর বলে কেউ একজন থেকে থাকলে—তাঁকে বোঝার জন্যেও এই শরীরটা হলো গিয়ে ওপারে যাবার সাঁকো। ঈশ্বর যদি সব জায়গায় থেকে থাকেন—তো তিনি অপমানেও আছেন—আহ্লাদেও আছেন। তার অল্পবুদ্ধিতে—সুক্তো পায়েস সর্বত্র তাঁর যাতায়াত—এই তো বোঝে বিশ্বনাথ।

সন্ধ্যেরাতে পড়তে বসে জানলা দিয়ে দেখতে পায়—গা জুড়োনো বাতাস অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তাতে কোথায় একটা গাছের মরা পাতা খসে গেল। এইসব ঘটনার কার্যকরণ খুঁজতে তার মন আর চায় না। মন বলে—অন্ধকার এত বড় কেন ? এত গাঢ় কেন ? যেমন কিনা সকালের রোদকে এত ব্যাপ্ত আর এত উজ্জ্বল লাগে কেন ? অন্ধকারের পিছনেই বা কে আছে ? আলোর পেছনেই বা কে ? যদিও সরল ফিজিক্স তাকে বোঝায় —এসবেরই পেছনে রয়েছে সূর্য আর পৃথিবীর বিরাট আড়াল। তবু মনের ভেতরে থেকে যায় জিজ্ঞাসা।

আজই সকালে সারা শিক্ষাসদনের প্রার্থনার পর প্রফুল্ল স্যার বললেন, আজ

রাতে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে। তোমার গুরু-মা যেতে বলেছেন।

গুরু-মা মানে স্যারের বউ। গেলেই খুব খাওয়ান তিনি। নানারকমের রান্নাও করেন তিনি। স্যার যেমনই হালকা পলকা, গুরু-মা তেমনি ভারি। চলতে ফিরতে কষ্ট হয় মহিলার। কিন্তু বেতের মোড়ায় বসে সারাদিনই আগুনের সামনে হাতাখুন্তি নাড়েন। এ ছবি স্যারের কোয়ার্টারে এসে আগেও দেখেছে বিশ্বনাথ।

যে মহামানুষকে ঘিরে সারাদেশে আজ নানান জায়গায় স্কুল, কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ভাণ্ডারা, প্রার্থনা, সেমিনার—তাঁরই নাম মাথায় নিয়ে এই শিক্ষাসদন। তিনি নাকি এখানেও একবার আসেন। তখন কিছুই ছিল না এখানে। স্রেফ একটা ভাঙা বাড়ি। আর একটা মাদারগাছ। সন্ধ্যে হলে তিনি ভাঙা বাড়ির ছাদে উঠে কলকাতার দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে ডাকতেন। ওরে কে আছিস আয়। এসে আমার যা-কিছু আছে নিয়ে যা। সবই তোদের—

এসব একশো বছরেরও আগের কথা। সেই মাদারগাছটা আর নেই। এখন এই শিক্ষাসদনের কৃতী সব ছাত্ররা সারাদেশে ছড়িয়ে। আর দু'মাস বাদেই বিশ্বনাথের ফাইনাল। অনার্স তার ফিজিক্সে। তাপ থেকে আলো। আবার সেই আলোই ছড়ায় তাপ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো অপচয় নেই। সব কিছুই পঞ্চভূতে মিশে যাচ্ছে। যা ক্ষয়ে যায়—তা লয়ে যান তিনি। এইভাবেই তো প্রজ্ঞানেত্রদা বলেন। ওঁর কথায় যশোরে টান থাকে একটা।

ক্লাশ এইটের র‍্যাপিড রিডারে পড়া কথাগুলো আজ এই সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে এত সত্যি লাগছে বিশ্বনাথের! হিট আর লাইটের বই দু'খানা নিয়ে পড়তে বসেছিল। কয়েক পাতা অন্তর অন্তর ফুটনোট। এই ফুটনোট থেকেই কোশ্চেন আসে। মেলাতে পারলে ছাক্কা নম্বর। সবার আগে তার এখন মাথাটা এক জায়গায় করা দরকার। একসঙ্গে এত জিনিস মাথার ভেতর গজগজ করে।

সে বাদে বাকি দুই রুমমেট বাড়ি চলে গেছে। একজন হায়ার সেকেণ্ডারির। শরৎ এখন সবে ফার্স্ট ইয়ারে। এতদিনকার এই হোস্টেলবাড়ি এবারে ফাইনাল দিয়ে তাকে ছেড়ে যেতে হবে। বড় মহারাজের ধ্যান হয়ে গেল। এবার তিনি ঘুরে ঘুরে সব ছেলের স্টাডি লক্ষ্য করবেন। নিচে রান্না-ঘরে ডালে ফোড়ন দিল ঠাকুর।

সেই ছ্যাকা দেওয়ার শব্দটাও বিশ্বনাথের কানে উঠে এল। ইদানীং বিশ্বনাথের যে কি হয়েছে—সে সব সময় তটস্থ থাকে। তার ঠিক পেছনে কার যেন এসে দাঁড়াবার কথা। সব সময় মনে হয়—সে এই এল বলে। এই এসে দাঁড়ালো বলে।

হিট আর লাইটের বই দু'খানাই টেবিলে তুলে দিয়ে বিশ্বনাথ ধুতির খুঁট টেনে গা জড়িয়ে নিল। একটানা হু হু করে বাতাস বয়ে চলেছে। খালি গায়ে একটু শীত-শীত লাগে। এই ক'বছরে হোস্টেলে সে এখন নিজের সব কাজ নিজেই করতে শিখেছে। ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির বইখানা বার করে একখানি ছবি বের করলো। কপালে সিঁদুর। হাসি হাসি মুখ।

ছবিখানা মাথায় ঠেকালো বিশ্বনাথ। সে জন্মালে ইনি চলে যান। মানুষ মরে গেলে কোথায় চলে যায়? এ প্রশ্ন সে অনেকদিন ধরে নিজেকে করেছে। সামনের অন্ধকার আকাশটার মতোই একটা বোবা দেওয়াল তার সব কোশ্চেনের সামনে দাঁড়িয়ে। আজ এখন এই আমরা হোস্টেল জমজমাট করে আছি। মাছের টুকরো ছোট হলে শরৎ খেতে বসে চেঁচাবে। প্রফুল্ল স্যার ক্লাশ নেবার সময় বোর্ডে যা লেখেন তার খানিকট পাঞ্জাবির ঢোলা হাতে মুছে যাবেই। প্রজ্ঞানেত্রদা ভোররাতে পুজোর ফুল তুলতে তুলতে যখন গান ধরেন—তখন রোদ বালাই শূন্য বাতাসে সে গান যেন আস্ত হয়ে ভাসে। তবু এসবই মুছে গিয়ে আরেক দল মানুষের জন্যে আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবো। আমাদের কলরোল বাতাসের ভেতরেই হারিয়ে যাবে। সাক্ষী থাকে শুধু মাদারগাছ, রেলস্টেশন, গড়ানে প্রান্তর।

একতলায় নিচের ক্লাশের ছেলেরা এবার লাইন করে খাবার ঘরে যাবে। তারই তোড়জোড় দু'ধারে দুই হোস্টেল বাড়ির ঘরে ঘরে। দিঘির পাড় দিয়ে প্রফুল্ল স্যারের কোয়ার্টারে যাবার রাস্তাটা ধরেই থমকে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। দূরে মাঠের ভেতর রোগাটে বুক নিয়ে আরেক হাজিপুরিয়া রাখাল যেন দাঁড়িয়ে। মাঠের ভেতর খড়কুটো জড়ো করে আগুন দিল নাকি? আগুনের লাল আলোয় রাখাল ছোকরার বুক-নাভি-ন্যাড়া মাথাটা অব্দি লাল লাগলো বিশ্বনাথের চোখে। আর সেই সামান্য আগুনের গা ধরে যেন অসংখ্য ভেড়া রোগা ছেলেটাকে ঘিরে ঘিরে চারপাশের ঘের ছোট আর টাইট করে আনছে। ওকে গরমে-আরামে সারাটা রাত ঘিরে রাখবে বলেই ভেড়াদের এই ঘোরা-ঘুরি। কয়েকটা ভেড়ার মাথা সেই লালচে আগুনে স্পষ্ট হয়ে উঠেই অন্ধকারে হারিয়ে যেতে জানান দিয়ে রাখলো—আমরা ভেড়ারা এখন এখানে আছি।

থাকলাম। রাত নিশুতি হলে আবার আমরা বেরিয়ে পড়বো খুট খুট করে। পাড়ি দেব কলকাতা।

কোয়ার্টারের বারান্দা থেকেই প্রফুল্ল স্যার বললেন, এই যে এসো বিশ্বনাথ —তোমার জন্যেই আমরা সবাই বসে আছি। এই আমার বড় ছেলে। ওরও নাম বিশ্বনাথ—

বারান্দায় উঠতে উঠতে বিশ্বনাথ বললো, সে কথা তো কোনোদিন বলেননি স্যার—

বলিনি বুঝি! তোমরা দু'জনে একবয়সীই হবে। ও এখন মেডিকেল কলেজে আছে—এবার ফোর্থ ইয়ার—

গুরু-মা বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, ওর এই কুড়ি পূর্ণ হবে অঘ্রাণে—

প্রফুল্ল স্যার বললেন, দোসরা ডিসেম্বর—

বিশ্বনাথ বললো, আমারও তো বার্থ-ডে দোসরা ডিসেম্বর স্যার। ওদিন আমারও কুড়ি হবে। ভারি আশ্চর্য!

গুরু-মা বললেন, সেহেরাবাজারে হেলথ্ সেণ্টারে ওর জন্ম। তোমার স্যার তখন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে বসন্তচণ্ডীর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে পড়ান।

সত্যি?

হ্যাঁ! কেন? কেন একথা বলছো বাবা—

বিশ্বনাথ বললো, আমারও তো জন্ম সেহেরাবাজারে। তবে হেলথ্ সেণ্টারে নয়। সেহেরাবাজারে আমাদের মামাবাড়ি। আমি জন্মাতেই মা মারা গেলেন। শুনেছি ক'দিন আমাকেও দাদামশায় ওখানকার ওই হেলথ্ সেণ্টারেই রেখেছিলেন। দিদিমা নেই তো। বাড়িতে অন্য মেয়েরাও কেউ ছিলেন না—যে দেখবেন।

প্রফুল্ল স্যারের ছেলে এই প্রথম কথা বললো, দেখুন তো—আমাদের একই নাম—একই দিনে জন্ম—আমরা জন্মেই একই হেলথ্ সেণ্টারে ছিলাম! কে বলতে পারে—আমরা বদলাবদলি হয়ে যাইনি!

বাইরে দূরে বাতাসের গড়াগড়ির শব্দ—শুকনো পাতায় ঘষাঘষি। তার ভেতরেই বিশ্বনাথ মাইতি বিশ্বনাথ ঘোষের ও কথায় ভেতরে ভেতরে আগাগোড়া চমকে উঠলো। গুরু মা তার ছেলের কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন। থেমে বললেন, সব গরম গরম রেডি। তোমরা এবারে খেতে বোসো।

দুই কামরার কোয়ার্টার। সামনে ভেতরে একটি করে বারান্দা। ভেতরের

বারান্দার শেষে রান্নাঘর-কলঘর। খেতে বসে তারই বয়সী স্যারের বড় ছেলের মুখখানা পারুলেডাঙার বিশ্বনাথ ভাল করে দেখতে পেল। ঝকঝকে নাক মুখ চোখ। তাতে কলকাতার পালিশ। চোখে চশমা। ডাক্তার হয়ে বসলে বেশ মানাবে। স্যারেরও ভালই হবে তাহলে। চাপ কমবে।

ঘোষ বিশ্বনাথের চোখে তাকিয়ে মাইতি বিশ্বনাথ থরথর করে কেঁপে উঠলো। সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল—আমরা বদলাবদলি হয়ে যাইনি তো?

যদি তাই হয়ে থাকে তো এখনো সময় আছে—দু'জনের গত কুড়ি বছরের জীবন ফের ওলোট-পালোট করে শুরু করতে হবে। ঘোষ প্রফুল্লকে আমি আর তাহলে স্যার বলে ডাকবো না। বরং কলকাতা থেকে ছুটিতে এসে ওই বিশ্বনাথ ডাকবে - স্যার। তারপর বাসে করে চলে যাবে পারুলেডাঙায়। সেখানে গিয়ে আমার বাবাকে ডাকবে—বাবা। মাইতি বিশ্বনাথের মনে হলো—যদি কারেকশনের দরকার হয় তো এখনি হোক। নইলে আর দেরি হলে গোলমাল আরও বেশি করে পাকিয়ে যাবে। তখন আর শোধরানোর কোনো রাস্তাই থাকবে না। ঘুড়ির সুতোর যমজট পাকালে যে দশা হয়—তখন আর পাল্টানোর কোনো রাস্তাই থাকে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। প্রফুল্ল স্যার অনেক জায়গায় চাকরি করেছেন বলে—বড় ছেলেকে কলকাতায় ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে রেখে পড়িয়েছিলেন। বলে জানালেন, হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েই এম. বি বি এস-এ ভর্তি। আর দেড় দু'বছর বাদেই ডাক্তার হয়ে বেরোবে খোকা।

মানুষের শরীর তো আপনারা পরিষ্কার জানেন—

খুব একটা নয়। একটা মড়া নিয়ে জনা তিরিশেক স্টুডেন্টের টানাটানি চলে। ওরই ভেতর হাত দিয়ে টিপে টিপে হাড়ের জোড়নার্ভ ফিল করে শিখতে হয়। মড়ার তো আজকাল খুব ভেরারিটি—

আবছা অন্ধকারে বারান্দায় বসে দূরের মাঠে তাকালো বিশ্বনাথ। বিরাট অন্ধকার প্রান্তরে আবার যদি একবার সেই লাল রাখাল একটুক্ষণের জন্যে ভেসে ওঠে—যাকে ঘিরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলা ভেড়াদের জটলা। ওদের গায়ের লোম পশমকলে জমা দিয়ে তবে এই কলকাতা যাত্রা। কোন এক অনির্দেশ জায়গার জন্যে সব কিছু জমা দিয়েই আমরা চলেছি তো চলেছি। আসলে কি আমরা সবাই শেষ পর্যন্ত সেই মড়া? মাইতি বিশ্বনাথ ফস করে বলে বসলো, সব মড়ারই তো আত্মা থাকে—

ঘোষ বিশ্বনাথ ফিক করে হেসে ফেললো। তা জানি না। তবে সব মড়ারই অ্যাবডোমেন, পসটিরিয়র, হার্ট, লিভার-থাকার কথা—যদি না রাখার দোষে খুব পচে যায়—বা নষ্ট হয়ে যায়--

হোস্টেলের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। দূরে খাবার ঘরে ঠাকুরদের হাতা-খুন্তির আওয়াজ। পারুলেডাঙার বিশ্বনাথের মনে হলো, এই শরীরের নিপাত কত সহজ। মৃত্যুর পর কেউ দাহ করছে—কেউ কবর দিচ্ছে। বেওয়ারিশ শরীর মানুষের শরীরকে বাঁচাবার জ্ঞান দিতে ছাত্রদের ক্লাসঘরে টেবিলে এসে শুয়ে পড়ছে। অথচ এই মড়াও একদিন মানুষ ছিল। কত নির্বিকার।

প্রফুল্ল স্যার বললেন, যে যেমন কাজ করে—তার তেমন সদ্‌গতি হয়।

বুঝলাম না স্যার।

কেউ মরলে চিতায় মঠ ওঠে। কেউ মরলে শকুনে শেয়ালে ছিঁড়ে খায়।

গুরুমা দাবড়ে উঠলেন। আর কি কিছু আলোচনার নেই?

প্রফুল্ল স্যার অন্য বিষয়ে যাবার জন্যেই যেন বললেন—স্বামীজীর কথায়—যার যে কাজ সে মন দিয়ে করলেই—কাজই তাকে স্বর্গের কাছে নিয়ে যায়। তুমি খুব মন দিয়ে ফুটবল খেললে—ওই ফুটবলই তোমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে—

স্যার। আমার বাবা মন দিয়ে বিশুদ্ধ সর্ষের তেল করেন—

তেল যতটাই বিশুদ্ধ—তিনি ততটাই স্বর্গের কাছাকাছি বিশ্বনাথ। আমি এতদিন মন দিয়ে ছাত্র পড়িয়ে আসছি। জানি না—আমার রাস্তা দিয়ে স্বর্গের কতটা কাছাকাছি এগিয়ে গেছি।

বারান্দার গায়ে ঘরের ভেতরটাও অন্ধকার ছিল। সেখানে বসেছিলেন—ঘোষ বিশ্বনাথের মা—মাইতি বিশ্বনাথের গুরুমা। তিনি বললেন, স্বর্গ না হাতি! আর ক'মাস পরেই তো রিটায়ার করবে। ছাত্র পড়াতে পড়াতে তুমি রিটায়ারের দিকে এগোচ্ছো। এর ভেতর স্বর্গ পেলে কোথায়?

এ কথার পর কেউ আর কোনো কথা বলতে পারলো না। স্যার কথায় কথায় যেমন অনায়াসে অন্যলোকে চলে যান—গুরুমা তেমনি অনায়াসে তাঁকে সেখান থেকে এই এখানে নিয়ে আসেন। একথা অনেকবারই মনে হয়েছে মাইতি বিশ্বনাথের।

রাতে হোস্টেলে একা একঘরে ঘুম আসতে চাইছিল না বিশ্বনাথের। ঘরের বড় জানলার সামনেই যাকে বলে দিগন্ত পর্যন্ত গড়ানো প্রান্তর। এখন আগাগোড়া অন্ধকার। আবার ভোর হলেই হা হা করে হেসে ওঠে সারা

মাঠ। এক একটা রাত্তির যেন বিশ্বনাথের কাছে লম্বা লম্বা অপেক্ষা। ভোর রাতে অন্ধকার কাটতে শুরু করলে তার মনটাও সুস্থির হয়ে আসে। মনে হয় এবার তো সে মাঠে বেরিয়ে পড়তে পারে। অন্ধকারের আর কোনো বাধা নেই। অথচ নতুন একটা ভোর মানেই তো—জীবন থেকে একটা পুরনো দিন খসে পড়লো।

সামনে ভোট। বোধহয় ফাইনাল পরীক্ষার মুখোমুখি ইলেকশন এসে যাবে। অন্ধকারের ভেতর এই মাত্র একটা মিছিল গেল পিচরাস্তা দিয়ে। পারুলেডাঙার দিকে। এত বড় পৃথিবীটা চালানোর জন্যে চন্দ্র-সূর্যের কোনো ভোট লাগে না। কিন্তু নিজেদের শাসন করতে আমাদের ভোট দরকার হয়।

এরকম আরও সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিশ্বনাথ ঘুমিয়ে পড়লো। ততক্ষণে সারা হোস্টেলের আলো নেভা সারা। ঘুমের ভেতর বিশ্বনাথ সেহেরাবাজারে নেমে গিয়ে হেলথ্ সেন্টারে গিয়ে হাজির। এখানে বিশ বছর আগের স্টাফ কেউ আছেন?

বিশ্বনাথের কথায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর বেরোলো—কম্পাউণ্ডারবাবু নাগাড়ে সাতাশ বছর আছেন।

তাহলে আপনিই বলতে পারবেন—

ব্যস্তসমস্ত বিশ্বনাথকে আমলই দিল না কম্পাউণ্ডারবাবু। কি বলতে হবে বলুন?

বিশ্বনাথ তাকিয়ে দেখলো, লোকটা ফরসা, বুড়ো, মাথায় পাকা চুল, গোল-গাল—কিন্তু এতই কেয়ারলেস—পান খেয়েছে—পানের পিক ঠোঁট গড়িয়ে চিবুক অব্দি। বিশ্বনাথ প্রায় ধমকে বললো, ঠিক বিশ বছর আগে—মনে করে দেখুন—মনে পড়ে কিনা—আজ থেকে ঠিক বিশ বছর আগে আপনাদের এই সেহেরাবাজারের হেলথ্ সেন্টারে দুটি পুরুষ খোকা আসে—

বাবার হাত ধরে বেড়াতে এসেছিল!

রসিকতা পরে করবেন। থামুন এখন। ঠিক বিশ বছর আগে—ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখে—

তারা এখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল?

একজন হয়েছিল কম্পাউণ্ডারবাবু। তার বাবা তখন বসন্তচণ্ডীর স্কুলে টিচার—

অন্যজন?

এই সেহেরাবাজারেই সে জন্মাতে তার মা মারা যায় এ্যাক্লেমসিয়ায়

তারপর ?

খোকাটির দাদু এসে তাকে হেলথ্ সেন্টারে দিয়ে যান—

তাই বলুন !—বলে কম্পাউণ্ডারবাবু একমুখ হাসলো। বিশ্বনাথ দেখলো ফরসা রঙের বুড়ো কম্পাউণ্ডারবাবু বেশ মোটাসোটা—গোলগাল। গায়ে ফতুয়া। ধুতির নিচে মোকাসিন। চোখে কেবল চশমা। অনেকগুলো জেমস ক্লিপ ঘেঁষাঘেঁষি করে এক জায়গায় দাঁড় করালে যা হয়—লোকটার নাকের নিচে গোঁফজোড়া তাই।

এতে রহস্যের কি পেলেন ?

কম্পাউণ্ডারবাবু হেসে বললেন, একটি খোকার বাঁ দিকের বুকে জড়ুলের দাগ।

আপনি আমার বুক-খোলা শার্টের ভেতর থেকে দাগটা দেখতে পেয়েছেন—

মোটেই না। আরও বলে দিচ্ছি। আপনার নাকের নিচে গোঁফ কেটে ফেললে—একটা বাদামী রঙের গোল স্পট চোখে পড়বে—গোঁফ দিয়ে আপনি সবসময় তা ঢেকে রাখেন।

হ্যাঁ। জানলেন কি করে ?

কম্পাউণ্ডারবাবু একগাল হেসে বললেন, তখন আমরা সব বেবিকেই এনামেলের গামলায় গরম জলে চুবিয়ে হট-বাথ দিতাম। আপনি তো আছেন পাকলেডাঙার মাইতি বাড়ি, তাই না ? ঠিক বলেছি ? তখন থেকেই কেসটা মনে গেঁথে আছে। থাকবারই কথা—

কেন ? একথা বলছেন কেন ?—বলতে বলতে বিশ্বনাথের বুকের ভেতরটা সবটুকু জানবার জন্যে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ওকথা বললো কেন কম্পাউণ্ডার—আপনি তো আছেন—আছেন মানে কি ? থাকেনও তো বলতে পারতো কম্পাউণ্ডার। আছেন আর থাকেন—যেন ভাড়াবাড়িতে—বা অন্যের বাড়িতে উঠে যাওয়া—

আপনি যেতেন তো বসন্তচণ্ডীর টিচার বাড়ি—

ধক করে উঠলো বিশ্বনাথের বুকটা। সে দু'হাতে কম্পাউণ্ডারের ফতুয়ার বুকপকেট টেনে খুলে ফেললো। তারপর জোরে চেঁচিয়ে বললো, কেন সেদিন পার্টির ভুল শুধরে দেননি ? বলুন ? বলুন ? আমাকে বলতেই হবে—

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী যদি বাড়ি যাবার সময় নিজের বেবি নিজে চিনতে না পারেন তো আমরা কি করব বলুন ?

ঠিক কি হয়েছিল খুলে বলুন।

অনেক দিনের কথা তো। সব মনে নেই। মাইতি বাড়ির বাচ্চাটাকে মাতৃহীন বলেই—প্রফুল্লবাবুর বেবির পাশে শুইয়ে রাখা ছিল।

একই কটে?

না। পাশাপাশি কটে। মাস্টারমশাইয়ের বউ নিজেরটি রেখে অন্যেরটি আদর করে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আপনারা দেন অ্যাণ্ড দেয়ার ভুল শোধরালেন না কেন? এ তো ক্রিমিনাল কেয়ারলেসনেস—

তখনই তো ধরা পড়েনি ভুলটা। ধরা পড়লো তিন দিন পরে। যখন পারুলেডাঙা থেকে এক খোকার বাবা তার মা-মরা বাচ্চাকে নিতে এলেন—

সে বাচ্চা তখন প্রফুল্ল মাস্টারের বাড়ি চলে গেছে!

কম্পাউণ্ডার গম্ভীর মুখে বললো, হুঁ। আমরা তখন আর কি করবো? বুকে জড়ুলের দাগ—নাকের নিচে বাদামী স্পট—প্রফুল্ল মাস্টারের খোকাকে তুলে দিলাম পারুলেডাঙার বাবার হাতে।

বাঃ! বাঃ! চমৎকার। বলতে বলতে মাইতি বিশ্বনাথ টের পাচ্ছিল—ভেতরকার চাপে তার বুকের দুই কপাট এখুনি ভেঙে পড়বে। কেননা সে পারলে এখুনি একতলায় স্যারের কোয়ার্টারে গিয়ে দরজা ধাক্কে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

কিন্তু এতদিন পরে আসল বাবাকে বাবা—আসল মাকে মা বলে ডাকা যায় না। ওদের বাড়ি আমার নিজের জেনেও ভেতরে ঢোকা যায় না। সেখানে অন্যকে ঘিরে স্নেহ। সে ভালবাসা মোছা যায় না। লজ্জা হয়। বিশ্বনাথ টের পেল—তার সেই লজ্জার ভেতর অভিমান তেজে ফেটে পড়ছে।

স্বপ্নের আকাশ খুব একটা উজ্জ্বল হয় না। দূর থেকে সাধারণ গাছপালাও বেগুনী দেখায় স্বপ্নে। শুধু মেঘ অ্যাজ ইটিজ। কালো, গম্ভীর। তার ভেতর ঠিক বিশ বছর আগের সেহেরাবাজারের হেলথ্ সেণ্টারের বারান্দা কম্পাউণ্ডার সমেত—একেবারে পুরনো বাঁধাই করা বইয়ের পাতার মতোই—সামান্য ঝাপসাও বটে—কারণ, স্বচ্ছ অয়েলপেপার দিয়ে জুড়তে হয়েছে।

অনেক কষ্টে ঘুম ভেঙে গেল বিশ্বনাথের। তখন সবে ভোর হচ্ছিল। আলোয় লালের আভা। মহামানবের মূর্তি ঘিরে আরেকটুকু বাদেই আরতি হবে। শিক্ষাসদনে এখন ঘরে ঘরে ধ্যান হবে। বালক, কিশোর, যুবক, মধ্যবয়সী মহারাজরাও তা থেকে বাদ যাবেন না। শুধু রেহাই থাকে প্রফুল্ল

স্যারের মতো টিচারদের। তাঁদের জন্যে প্রেয়ার বা মেডিটেশন কমপালসারি নয়।

আমি তাহলে কে? আমি আসলে কার সন্তান? যদি সত্যি সত্যিই বদলাবদলি হয়ে থাকে সেহারাবাজারের হেলথ্ সেন্টারে। বিশ বছর আগে কোনো হসপিটালেই কি তেমন নজরদারি ছিল? এখনো তো অনেক হাস-পাতালে কুকুর ঘুরে বেড়ায় ওয়ার্ডে। নবজাতক যায় চুরি।

ওরে বাবারে! আর ভাবা যায় না। বুক বুজে আসে। দুপুরের বাসে সে পারুলেডাঙায় এসে নামলো। এবার বিহার মধ্যপ্রদেশে নাকি আদৌ কোনো নিম্নচাপ তৈরি হয়নি। তাই এখানকার সারাদেশে শুধু আঁধি আর আঁধি। বাতাস পুড়ে যাচ্ছে তাতে। বাসের জানলায় বসে দু'ধারের মাঠ জ্বলে যাচ্ছে দেখতে দেখতে বিশ্বনাথ বাড়ি এসেছে। কোথাও একটু ছায়া নেই। অথচ কাল সন্ধ্যেরাতেই এদিককার সারা মাঠ অন্ধকারের দাপটে শূন্য হয়ে ডুবে ছিল—আর তার ভেতরেই কোন হাজিপুরিয়া রাখাল কিশোর খানিকক্ষণের জন্যে খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে রুটি সেঁকতে বসেছিল। নিশ্চয়। নয়তো এই মাঠে সারাদিনের আগুনের পর কার শখ হবে ফের আগুন ধরাবার। মানুষের পেটের খিদে সবচেয়ে বড় আগুন এ দুনিয়ায়। কাল সন্ধ্যেরাতে সেই আগুনেই যেন হাজিপুরিয়া রাখাল ছেলেটার খোলা গা, নাভি, বুক, মুখের ছায়া লালচে হয়ে উঠেছিল। অল্পক্ষণের জন্যে। সেই আভার ভেতর লোমছাটা ভেড়াগুলো গুঁতোগুঁতি করে তাদের পালকের কাছাকাছি আসতে চাইছিল।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে বিশ্বনাথ তাদের মাইতি নিবাসে ঢুকতে যাবে—এমন সময় উঁচু সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল—লাইট রেলের সরু পাটির ওপারে নাবাল জমি ডিঙিয়ে ছাতা হাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে। পেকে আসা বোরোধানের দাগে দাগে নালা কেটে জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা দেখছে। সঙ্গে জনা তিনেক লোক। আর স্যালোর একটানা বটবট।

এ আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নয়। বলতে বলতে লাইন টপকে—নির্জন পারুলেডাঙা প্ল্যাটফর্ম মাড়িয়ে—নাবাল টপকে একদম জমির আলে গিয়ে উঠলো বিশ্বনাথ। এই দুপুর রোদে তুমি কোথায় রেস্ট নেবে বাবা-

কে? বলেই মহেশ্বর মাইতি বিশ্বনাথকে দেখতে পেল। বিশে? তুই? এই এখন চলে এলি? ক্লাশ বন্ধ?

না বাবা। কিছুই ভাল লাগছিল না—তাই চলে এলাম—

বেশ করেছিস। ঘরে চল—

তুমিও চল বাবা।

চোদ্দ বিঘের এই জায়গাটায় জল লাগানো বাকি বিশে—তুই যা—আমি যাচ্ছি।

না। তুমিও চল বাবা। এত ধান দিয়ে কী হবে আমাদের?

তাই বলে ফলাবো না বিশে? এই সেচটা পেলেই ধান পুষ্ট হবে বাবা!

পৃথিবীর ভেতরে বলে পাকলেডাঙায় অন্য জায়গার সঙ্গে রাত আসে, ভোর হয়, দিন যায়। সকালের আপ-ট্রেন বাওয়ালি, বসন্তচণ্ডী, রায়নগর, ভোর-কোনা হয়ে সেহেরাবাজারে এসে ইঞ্জিনকে জল খেতে দেয়। তারপর বেলা-বেলি ইন্দাস হয়ে ট্রেনটা একদম বাঁকুড়া গিয়ে থামে। ভোটের পর বিজয় উৎসব থাকলে এই ট্রেনে চড়েই তল্লাটের চাষীবাসী মানুষগা সেখানে মিছিল করেই যায়। এরই ভেতর বৃষ্টি এসে পৃথিবীর গায়ে জল দেয়। রোদ এসে তো শুষে নেয়। যা কিনা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। হতে থাকবে। হয়েও যাবে। তবু দুনিয়াটা পুরনো হয় না কিছুতেই। হবেই বা কি করে? মানুষই জন্মে জন্মে পৃথিবীটা পুরনো করে ফেলতে পারলো না। আর রোদ বৃষ্টি তো কোন ছার।

কলকাতা থেকে সর্ষের লরি এসে থামলো। মহেশ্বর মাইতি ডাক ছাড়লো, ও বিশে—লরি এসেছে—

তা আমি কি করবো?

বাঃ! তোমার তেলকল—তুমি সর্ষে বুঝে নেবে না বাবা?

আমার কোথায়!

কি বলিস বাবা! তেলকল তো তোমার। আমার বিষয়-সম্পত্তি—সবকিছুই তোমার। এবার সব তুমি বুঝে নাও বিশ্বনাথ। তুমি এখন গ্র্যাজুয়েট হয়েছো। আর খোকাটি নও।

বছর ঘুরে এখন শীতের সময়। সকালবেলা। অঘ্রাণের মাঝামাঝি। ক'মাস হলো বিশ্বনাথ অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। গায়ের আলোয়ানটা সাবধানে কাঁধে তুলে নিল বিশ্বনাথ। ইলেকট্রিক ঘানির বেল্টে পাছে জড়িয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি বাধে। একদিকে সর্ষে গাদানো চলছে, অন্যদিক দিয়ে পাইপ বেয়ে গাঢ় হলুদ তেল নেমে এসে ড্রামে পড়ছে। ড্রামের গায়ে কল বসানো। সেখান থেকে ষোল কিলোর টিন ভর্তি হয়ে সিল হয়ে যাচ্ছে নগদ নগদ। এ

জন্যে কালাই মিস্ত্রি দু'জন করে সবসময় মজুত থাকে। সিল টিনের গুদাম পাশেই। সেখান থেকে টিন টিন তেল ওদিকে ইন্দাস—কলকাতার দিকে মির্জাপুর—বাঁকিপুর ছাড়াও কর্ড লাইনের শিবাইচণ্ডী অব্দি চলে যায়। আর সদর বর্ধমান অব্দি তো যায়ই। পাকুলেডাঙার এই পিওর অয়েল মিল আর পাঁচটা সর্ষে ঘানির মতো নয়। এখানে আগাগোড়াই কলের কারবার।

গত ক'মাস মহেশ্বর মাইতির মুখে ওই কথাগুলো শুনে আসছে বিশ্বনাথ। কোথায় সেই হোস্টেল জীবন! প্রেয়ার—একসঙ্গে সবাই মিলে খেতে বসা। প্রজ্ঞানেত্রদার গলায় ভজন। প্রফুল্ল স্যারের ক্লাস। ও সবই এখন এই ক'মাসের অদেখায় যেন অন্য কারও জীবনের ব্যাপার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে বিশ্বনাথের জীবনের কোনো যোগ নেই। এখন সে এই পিওর অয়েল মিলের উত্তরাধিকারী। মহেশ্বর মাইতি চোখ বুজলে ওই পাকুলেডাঙা বাজারও নাকি তাকেই তদারকি করতে হবে। বাজারের মাঝখানে মোতি-হারি তামাকের গদিঘর—যেখানে এখন রাঙাকাকা বসে—ওখানকার সবও নাকি তাকেই বুঝে-সুঝে নিতে হবে। নিতে হবে পাকুলেডাঙার সবেধন সিনেমা হলটির হিসেবপত্তর।

রাস্তা দিয়ে পাকুলেডাঙার মানুষজন যায় আসে। তারা এমন চোখে তার দিকে—তার বাবার দিকে তাকাতে তাকাতে যায়—যেন তেলকলের গদিতে আধশোয়া মহেশ্বর মাইতি কুবেরের চেয়েও ধনী। আর তারই একমাত্র ব্যাটা—সে না-জানি কত হীরে মুক্তো চুনী পান্নার মালিক। ওদের চোখ-মুখ দেখে বিশ্বনাথ কুঁকড়ে যায়। যা ওদের নেই—তা আমাদের আছে—তাই আমরা ওদের চোখে আলাদা। এই পৃথিবীর মানুষই নয়। এই তাকানো একদম সয় না বিশ্বনাথের।

হপ্তার হিসেব রেখে দিয়ে সিনেমা হলের ম্যানেজার চলে যেতেই বিশ্বনাথ খুব শান্ত গলায় জানতে চাইল, সেহেরাবাজারে হেলথ্ সেণ্টারে আমায় যখন দিয়ে এলেন দাদু—তুমি কি করছিলে বাবা?

লরি থেকে সর্ষের বস্তা নেমে লোকের মাথায় মাথায় গোডাউনে যাচ্ছিল। আধশোয়া অবস্থায় সবই হিসেব রাখছিল মহেশ্বর মাইতি চোখে চোখে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে মহেশ্বর বললো, আর কতবার পুরনো কথা শুনাব?

পুরনো হয়নি বাবা। বল—

রীতিমতো গ্র্যাজুয়েট ছেলের গলায় এমন নরম ঘনিষ্ঠ টান শুনে মহেশ্বর

থাকতে পারে না। পড়ে থাকলো সর্বের বস্তা চোখে দেখা আর মনে মনে মানসাঙ্ক। ফের শুনবি তো শোন। আমি তখন ছবিঘর খানা লিজ নেবো বলে বর্ধমান সদর বাজারে রাজকৃষ্ণ বাবুদের গোলায় হুণ্ডি কেটেছি। তোমার মাতৃদেবী তোমায় গর্ভে নিয়ে তখন সেহেরাবাজারে তাঁর পিত্রালয়ে—

বাবার মুখে হঠাৎ এই সাধু ভাষা শুনে কুলকুল করে হাসি এসে গেলেও চেপে থাকে বিশ্বনাথ।

আমি কোনদিকে যাবো! এই বুঝি একটুর জন্যে সিনেমা হলখানা হাত-ছাড়া হয়ে যায়—

আমার জন্যে তোমার কোনো ভাবনা ছিল না তাহলে?

সে কি কথা? রোজগার করে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অনেক বেলা হয়ে গেল। একেই বেশি বয়সে বিয়ে করেছি, তায় তোমার মাতৃদেবী মাতৃহীনা আদুরে গোবরে মানুষ হওয়া। আমার মন তো সেহেরাবাজারে পড়েছিল। কিন্তু টাকার জন্যে কোথায় না গিয়েছি! তোমায় ভূমিষ্ঠ করে তোমার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করলেন—

মাকে শেষ দেখা দেখেছিলে তুমি?

মহেশ্বর মাইতি দেখলো, ভীষণ শব্দ করে তেলকলের স্যাফট্ খানি ঘুরছে। সেটা নব ঘুরিয়ে মোলায়েম করে দিয়ে এসে বললো, দুঃসংবাদ সময়মতো পারুলেডাঙায় পাঠিয়েছিলেন তোমার মাতামহ। কন্যাশোকে অধীর হয়েও ভুল করেননি। তোমায় হেলথ্ সেণ্টারে দিয়েই লোক পাঠিয়ে দেন—কিন্তু আমি তো লিজ দলিল করতে ছুটেছি—কলকাতায়। ফিরে এসে শুনলাম—সব শেষ। বডি রাখতে না পেরে দাহকার্য সেরে ফেলেন ওঁরা—

আচ্ছা বাবা—দাদু তো তখন বুড়োমানুষ?

হুঁ।

তুমি কলকাতায়। মা নেই।

কি বলতে চাস?

হেলথ্ সেণ্টারের নার্সদের ভুলেও তো বাচ্চা বদলাবদলি হয়ে যেতে পারে—আমাদের বাড়ি থেকে দেখার তো কেউ ছিল না।

তার মানে?

ধরো আমি চলে গেলাম অন্য বেডে। আর সেই বেডের বাচ্চা নার্সদের ভুলে চলে এল আমার জায়গায়।

কী সব অলুক্ষণে কথা সকালবেলায়—

তুমি সেই বদলি বাচ্চাই হয়তো নিজের ছেলে ভেবে এতদিন ধরে করে এসেছো।

চুপ করে বিশ্বনাথ। আবুড়ে কথা আমার ভাল লাগে না। তুমিই আমার ছেলে। তোমাকেই তোমার মা ভূমিষ্ঠ করে স্বর্গারোহণ করেন।

তোমার সাদা সর্ষের বস্তা কি গুদামঘরে অন্য সর্ষের ভেতর হারিয়ে যায় না?

গেলেও আমি তাদের চিনে বের করতে পারি বিশ্বনাথ। আমার কাছে কোথাও গাফিলতি পাবে না।

মা মারা যাওয়ায় দাদু সেদিন দাদুতে ছিলেন না। তুমি সিনেমা হাউসের লিজ দলিল করতে ব্যস্ত। আমার হয়ে আমাকে দেখার কেউ নেই। অবস্থাটা ভাল করে বুঝে ছাখো বাবা। তখন হয়তো কোনো আনাড়ি নার্স নিজের ভুলে—সব বাচ্চাই তো প্রথম ক'দিন এরকম দেখতে হয়—আমাকে শুইয়ে দিল অন্য বাচ্চার জায়গায়—আর সেই বাচ্চাকে রেখে এল আমার জায়গায়?

মহেশ্বর মাইতি ভ্রূ কুঁচকে নিজের ছেলের মুখে তাকালো। কেন? এসব কথা এত দিন পরে কেন?

নাঃ! এমনি।

আমার মতো অশিক্ষিত মানুষকে বাবা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?

তা কেন? আমার তো কোনো অভিযোগ নেই বাবা।

জেনে রাখো—তোমার বাবা এই মহেশ্বর মাইতি কোনো জিনিস ফাঁকি দিয়ে করে না। বিঘেয় বোরোধান যেমন একুশ মণ করে ফলাই—তেমনি এ তল্লাটে সেরা সর্ষের তেল আমার কল থেকেই বেরোয়। যার জন্যে যতটুকু করার—তা আমি করি বিশ্বনাথ। তারপরেও যদি ভুল থাকে তো বুঝবে—সব ভুল শোধরাবার নয়। কিছু ভুলের গিঁট ভগবান নিজেই দিয়ে রাখেন।—বলতে বলতে মহেশ্বর মাইতি ভেতরবাড়ি চলে গেল।

বিশ্বনাথ ভাবলো, বাবাকে না জানি কোন অজানা জায়গায় ঘা দিয়ে বসে আছি। পারুলেডাঙায় বাজার, তেলকল, তামাকের দোকান, টকি হাউস—তাছাড়া জায়গাজমি সবই মহেশ্বর মাইতি গায়ে খেটে—মাথা খেলিয়ে করেছে। পাশে মা নেই। মানুষটার জন্যে তার মনের ভেতর নদীতীরের ঢেউ ফিরে আসার মতোই স্নেহ-মমতা-ভালবাসা গুটিয়ে গুটিয়ে পাক খেয়ে ফিরে আসতে লাগলো।

তবু সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে পড়লো—আসলে হয়তো মহেশ্বর মাইতির ছেলেই এখন প্রফুল্ল স্যারের ছেলে হয়ে ডাক্তারি পড়ছে। আর প্রফুল্ল স্যারের ছেলে পিওর অয়েল মিলে বসে আছে।—একথা মনে হতেই সে নিজের নিচের ঠোঁট অন্যমনস্ক অবস্থায় কামড়ে ফেললো।

ওরে বাবা! বাবা বদলাবদলি? ওরকম হয়ে থাকলে তো তাই-ই দাঁড়ায়।

ঠিক তখনি মহেশ্বর মাইতি ইমারতী দোকানঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিশ্বনাথ বললো, বাবা—আমি কলকাতায় গিয়ে এম. এস-সি পড়বো।

তোমায় অত কিছু পড়তে হবে না। গ্র্যাজুয়েট হয়েছো—ঢের হয়েছে। সর্ষের লরি খালাস হয়ে গেলে বুঝে নিয়ে চালান সই করবে। আমি এখন চাদ্দিক ঘুরে-ফিরে বেড়াবো—

বলেই মহেশ্বর মাইতি পারুলেডাঙার মেন রোডে নেমে পড়লো। পায়ে মোকাসিন। ফেরতা দিয়ে পরা ধুতির ওপর সার্জের ফতুয়া। হাতের কব্জিতে গোল এক পাথরবাটি ঘড়ি। দিব্যি রেললাইন টপকে মহেশ্বর তার বোরো-ধানের বারো বিঘের দাগটা পেরিয়ে খোলা ধানক্ষেতে পড়লো।

এদিকটা পারুলেডাঙা পড়েনি। ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ক্যানেল। তার কাটা মাটির ঢিবি দুই মানুষ সমান হবে। সেটা টপকে শীতের শুখো খালের গায়ে একখানা তালপাতার কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালো মহেশ্বর। কাদা আছিস নাকি? ও কাদা?

চেঁচাচ্ছো কেন? এই তো আমি।

মহেশ্বর দেখলো, মধ্যবয়সী কাদা খোলা গায়ে পাঁচন হাতে গুটি পাঁচেক ছাগল চরাচ্ছে।

এবারে একখানা ঘর তোল। আরও না হয় পাঁচশো টাকা দে যাবো—

সে দেবার ইচ্ছে যখন দেবে! টাকা পেলি কার না ভাল্লাগে। কিন্তু আমি ঘর তুলছি না!

তোর ওই কুঁজির ভেতরে শুতি আমার কষ্ট হয় না? পাঁচশো না—হাজার টাকা দে যাবো। এট্টা পাকাপাকি কুয়ো খোঁড়া। তেষ্টা পেলি তোর আর আমার জন্যি রেল কোম্পানীর কলের যে জল আনতি হবে না কাদা।

এঃ! পনের বছর ওই কুঁজিতে শুয়ে এলে তোমার কাদামণির সঙ্গে। এখন ঘরদোর বানায়ে ভদ্দরলোক হবার শখ হয়েছে!

মহেশ্বর মাইতি কোনো জবাব দিল না। মেয়েলোক—সে যা দেখে আসছে—বয়স হয়ে গেলে বুদ্ধিসুদ্ধি একদম শুকিয়ে যায়। শীতের বেলাবেলি পাকা রোদ একটা তালগাছের মাথায় ফাঁকফোকরে ছেঁকে বেরিয়ে আসছে। সে শান্ত গলায় বললো, নে এক গ্লাস জল দে—

তাই বলা। তেষ্টা পেয়েছে—

বিশেকে কোলে করে হোস্টেলে দিয়ে আসার পর এই কাদা তার জুটে যায়। তখন সবে কাঁচা পয়সার আমদানি শুরু হয়েছে। কার না কার বউ ছিল। খেতে না পেয়ে তার কাছে আসে। গোড়ায় গোড়ায় লজ্জা পেতো মহেশ্বর—তাই এই ক্যানেলের ধারে ঘর বেঁধে দেয়। সে ঘর এক ঝড়ে উড়ে যাওয়া ইস্তক কাদা এই ঝুপড়িতে।

জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মহেশ্বর বললো, এই গাছতলাতেই বসায়ে রাখবি?

নাও। চল। ঘরে চল। কুঁজি বল—ঘর বল—আছি তো এর ভেতর তাও আট দশ বছর।

মাথা নিচু করে মহেশ্বর মাইতি ভেতরে ঢুকলো। আগেকার ভাঙা ঘরের কাঠামোর ওপর মাটি, চুন আর ছনের কুচো দিয়ে শক্তপোক্ত দেওয়াল। ওপরে ছেঁড়া ক্যাম্বিশ—কিন্তু তাতে বছর বছর লাউ কুমড়োর ডগা তুলে দেওয়ায় পুরু ছাদটা পুরো সবুজ। মহেশ্বর মাইতি পাকাঘর তুলে কাদাকে এ জায়গা থেকে সরাতে চেয়েছে অনেকবার। কাদা রাজি হয়নি। বলে—এই আমার ভাল। লোকালয়ে গিয়ে তো শুধু নিন্দে-মন্দ শুনতে হবে। চরিত্তির তো আমার ভাল নয়—

এখানে রাতবিরেতে একা একা তোর তো ভয় করে কাদা—

কিসির ভয়? দেশসুদ্ধ চোর-ডাকাতরা জানে আমি কার মেয়েমানুষ। এট্টা ভয়ডর আছে না তাদের—

মেয়েমানুষ কথাটায় ফিরে তাকালো মহেশ্বর। কাদা আর সেই কাদা নেই। বয়সে কালচে দাগ কপালে। এই কাদা একসময় বেশ মোটাসোটা ছিল। তখন গরমকালে কাদা মাথার চুলের কাঁটা খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা মহেশ্বরের পিঠে পটাপট ঘামাচি মেরে দিয়েছে। দিতে দিতে হেসে ফেলতো। করেছেন কি মাইতি মশায়! সারাটা পিঠ যে অড়হড় ক্ষেত—গাছ তোলার পর—

কেন রে কাদা?—বলতে বলতে পাশ ফিরে চিৎ হয়ে মহেশ্বর খানিকক্ষণ

খ হয়ে থাকতো! গ্রাম-দেশের মেয়ে কাদা। মেইন লাইনে বলাগড় হয়ে ওর বাপের বাড়ি যেতে হয়। মুখখানা পানপাতা। মাথাভর্তি কালো চুল। হাসলে ভারি সুন্দর। এমন মেয়ে চরিত্রের অপবাদ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাপের তিন কুলে কেউ নেই। ফেরার রাস্তা বন্ধ। কোন হাটে বিক্রি হয়ে যেত মেয়েটা। তারপর ট্রেনে ট্রেনে পাচার। তাই একদম কুড়িয়েই নিয়েছিল মহেশ্বর।

ওমা! তাও জানেন না? অডহড় ক্ষেতে গাছ তুলে হাল চষলি যা হয় —তাই করি এনেছেন পিঠখানা। নিন্—উপুড় হন। দেখি আর কটা মারতি পারি—

আরেকদিন মহেশ্বরকে বলেছিল, পয়সার পিছনে ঘুরতি ঘুরতি আপনি কিন্তু বুড়োয় যাচ্ছেন। এই কয়ে দেলাম—

কেন রে কাদা?

হাসেন না। ঝগড়া করেন না। এমন পুরুষ কি মেয়েমানুষ ধরে রাখতি পারে?

কেন? তুই কি পালায়ে যাবি?

আমার কথা ছাড়ান দিন! আমি বলি আর পাঁচজন মেয়েমানুষের কথা। খেটে খেটে এত পয়সা রাখবেন কোথায়? শেষে না পারুলেডাঙার নাম তুলি দিয়ে স্টেশনের নাম রাখতি হয়—পয়সাঘাট!

আজ এই সকালবেলার শীত শীত রোদে খোলা ধানক্ষেতের ভেতর রীতি-মতো বিষণ্ণ মহেশ্বর মাইতির কী যেন হয়ে গেল। সে আবারও জানতে চাইল, থাকিস তো ইরিগেশনের বেওয়ারিশ জায়গায় কুঁজি বেঁধে। রাতবিরেতেও কি ভয় করে না?

নাঃ! ঝড়জল হলি ওই ছাগল-পাগলগুলো নিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকি। সাপ বেরুলে উঁচু জায়গা দেখে উঠে বসি। কি আর হবে মাইতি মশায়। মোটে এট্টা তো প্রাণ—

না। এবারে ইট ফেলতি বলি। আমার নিজির জায়গায় তোর পাকাঘর বেঁধে দেবো।

কোনো দরকার নেই। এখানে ঘুম ভাঙলি দিব্যি সূর্য উঠতি দেখি। আর নিশুতি রাতে ঘুম কেটে গেলি দেখি—খোদ চাঁদ আমারে পাহারা দিচ্ছে। কি হবে ঘরদোর বেঁধে? ভুলে যেও না—তোমার ছেলে বড় হয়েছে। সে জানে আমার কথা?

ভুল করিসনে কাদা—পুরুষলোক নিজিদের ভেতর মেয়েমানুষ নিয়ে কথা বলে না।

আহা! তোমরা তো বাপ-ছেলে—

বাপ-ছেলেতে এসব নিয়ে তো আর ও কথা হয় না। তুই কি সংসারের নিয়মনীতি সব ভুলে বসে আছিস?

হাতের পাঁচনখানা নিয়ে একটা ছাগল তেড়ে দিয়ে এসে একটু বসলো কাদা। তারপর একগাল হেসে বলল, আমি আর সংসার করলাম কোথায় মাইতি মশায়!

দিনের বেলায় রোদের আলোয় রেলস্টেশন, সদর রাস্তা, বাঁদরলাঠি ফুলের গাছটা পর্যন্ত হেসে ওঠে পারুলেডাঙায়। এখন শীতের মাঝামাঝি। চাষী-ঘরের বউরা অব্দি জিরেন কাটের রসটা জ্বাল দিয়ে নলেনগুড়ের নাগরি মাথায় করে বাজারে চলে আসে। ধানকাটার পর মাঠ ছেঁচে ধরা মাছে মাছে বাজার ছয়লাপ। যত দিন বাড়ে পারুলেডাঙা যেন জমে ওঠে। আর সন্ধ্যেরাতের ইলেকট্রিক আলোয় যেন ঝকমক করতে থাকে।

বিশ্বনাথকে গোড়ামুখো হয়ে বসে থাকতে দেখে তার রাঙাকাকা এসে বললো, চল—চুনের ভাটির শামুক আনতে যাবো। লম্বা রাস্তা। ঘুরে ঘুরে সব দেখবি।

কাকাদের ভেতর রাঙাকাকা কিছু অন্যরকম। বিশ্বনাথ লক্ষ্য করেছে—বাজারে মোতিহারি খোলায় সারাদিন গুড় মেশানো তামাকের গন্ধের ভেতর মানুষটার মুখে হাসি কখনো নিভে যায় না। মাপঝোকের ভেতর ওজনদারি সারতে সারতে রাঙাকাকা দু'একটা রসিকতাও করে নেয় খদ্দেরদের সঙ্গে।

রাতে লরি ছাড়লো পারুলেডাঙা। নিজেদের লরি। ড্রাইভারকে পেছনে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিয়ে রাঙাকাকাই চালাতে লাগলো। তার পাশে বিশ্বনাথ। তার বাবার কথামতো 'বারোবারে' এই তার প্রথম বেরোনো। বর্ধমান, বাঁকুড়া ছাড়িয়ে গাড়ি যাবে পুরুলিয়া জয়চণ্ডী পাহাড় ছাড়িয়ে। কাল সন্ধ্যে সন্ধ্যে চালানী শামুক গন্ত করে ফিরতে হবে। রওনা হতে হতে সেই রাত হয়ে যাবে। রাতেই লরি চলে ভাল।

রাতের বেলায় পৃথিবী লরির আলোর হেডলাইটে অন্যরকম হয়ে যায়। গরম পাঞ্জাবির ওপর আলোয়ান, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। তবু পায়ে শীত করছিল বিশ্বনাথের। পা গুটিয়ে হেলান দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলো এক ঝাঁকুনিতে। কী ব্যাপার?

ও কিছু না। বাম্পার। দিব্যি ঘুমিয়ে নিলি—

আমরা কোথায় এখন রাঙাকাকা?

আধঘণ্টা আগে দুর্গাপুর ফেলে এলাম।

তাহলে এখন বাঁকুড়ায় আমরা—

রাঙাকাকা কোনো জবাব দিল না। কিন্তু খানিক বাদেই তাকে লরি থামাতে হলো। হেডলাইট দুটো পুরো জ্বলে উঠতেই হাইওয়ের গায়ে ঘাস, ঘাসের মাঠ ঘেঁষে সাদা হলুদ থোকা থোকা কী যেন পড়ে আছে দেখতে পেল বিশ্বনাথ। লরি শব্দ করে একটু এগোতেই রাঙাকাকা হো হো করে হেসে উঠলো, আর ঘুমোবার জায়গা পায়নি—

বিশ্বনাথ ভাল করে তাকিয়ে চিনতে পারলো। এ তার জানা ছবি। চেনা ছবি।

ভেড়ার পাল মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। মাঠ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা রাস্তা অব্দি চলে এসেছে। দূরে কাঠকুটো দিয়ে জ্বালানো আগুনটা নিভু নিভু। সেখানে একটা ঘুমন্ত ছেলের আভাস। আর তাকে ঘিরে থোকা থোকা ঘুমন্ত ভেড়া। রাত তাহলে বোধহয় এখনো নিশুতি হয়নি। হলে পর ওদের রাজা হাজিপুরিয়া রাখাল আকাশের তারা দেখে দেখে রাস্তা ঠিক করবে। সে রাস্তা এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে চলে গেছে। সে রাস্তা পৃথিবীর ঠিক উল্টো। পৃথিবী চলেছে ইলেকট্রিক আলো, রেলগাড়ি, বাস, টেলিফোনের ভেতর দিয়ে, আর ও রাস্তা যায় এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে।

বিশ্বনাথের রাঙাকাকা ড্রাইভারকে তুলে দিল রাত থাকতেই। তারপর নিজে স্টিয়ারিং থেকে সরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। ডিজেল ফিল্টারে ধুলো ঢোকায় লরি থামাতে হলো ভোররাতে। তখন বিশ্বনাথ পরিষ্কার দেখলো একটা পাহাড় জেগে উঠছে ফুটি ফুটি আলোয়। ওটা কোন পাহাড় গো?

জয়চণ্ডীর পাহাড়। এটা পেরোলেই শামুকের গোলা।

বনেট তুলে ড্রাইভার কী একটা জ্বালে ফুঁ দিতে লাগল। রাঙাকাকা বললো আয় চা খাবি।

ভোরবেলা একেবারে কনকনে শীত। দুধারের শালগাছের পাতা থেকে টুপটাপ শিশির পড়ছে। লতানো গাছে আর পাতায় পাহাড় প্রায় ঢাকা পড়ার যোগাড়। পাঞ্জাবি ধাবার পেছনেই জঙ্গল।

চায়ের খুরিটা ফেলে দিয়ে বিশ্বনাথ খানিক এগিয়ে দেখলো—রাস্তা থেকে উঁচুতে পাহাড়ের কানাৎ ঘেঁষা পায়ের ওপর পরপর কয়েক সানকি ভাত

সাজানো। ঠাণ্ডায় সাজিয়ে দেওয়া তরিতরকারি জমে বরফ। তাতে কাকের দল নেমে পড়ে রীতিমত পিকনিক জুড়ে দিয়েছে।

এক চৌকিদার যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে বিশ্বনাথ বললো, ও কার ভাত?

চৌকিদার একবার দেখে বললো, আজও খায় নাই—

কে?

সাধুবাবা। ক'দিনই কিছু খাচ্ছেন না—

চৌকিদার চলে যেতে বিশ্বনাথ লতাপাতা ধরে পাহাড়ের কাণাতে উঠলো। আসলে জয়চণ্ডী ঠিক পাহাড় নয়। পৃথিবী তৈরি হওয়ার সময়কার একটা গণ্ডগোল মাত্র। বড়জোর দেড় দু'হাজার ফুট উঁচু হবে। পৃথিবীর পেটের ভেতরকার মালমশলা নিয়ে জমাট বেঁধে দাঁড়ানো। তার গা দিয়ে একটা বিরাট গর্ত। গুহাও হতে পারে। সেখান থেকে একটা কুকুর যেন গান গাইতে গাইতে দুলকি চালে বেরিয়ে এল।

আর অমনি বিশ্বনাথ তার ভেতরে ঢুকে পড়লো। চাপা গুমসানো গন্ধ, চামচিকের ওড়াউড়ি। পাথর ফাটিয়ে গাছের শিকড়। যা থাকে যে কোনো গুহায়। বেশ খানিকটা এগিয়ে সেখানে বাইরের সকালের আলো কমে এল। গুহার ছাদও নেমে এসেছে। এবার এগোতে হলে হামাগুড়ি দিতে হবে।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে কে যেন তাকে ডাকছে—বিশ্বনাথ। ও বিশ্বনাথ—ডাকটা বড়ই সুদূর। এ নিশ্চয়ই রাঙাকাকার গলা।

ভেতরের দিকে ভাল করে চোখ চেয়ে বিশ্বনাথের মনে হলো একজন মানুষ আসন করে বসে আছেন। মানুষ ঠিক নয়—যেন বা মানুষের ছায়া।

ঠিক তখনই বাইরে বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ ডাকটা প্রবল হয়ে উঠলো। তাকে ফিরতে হলো।

বেরোতেই রাঙাকাকা। ওর ভেতরে ঢুকেছিল কেন?

একটা লোক বসে আছে মনে হলো।

হ্যাঁ। অনেক দিন ধরে ওখানে এক সাধুর আস্তানা। কখনো সখনো বেরোন। নয়তো ধ্যানেই থাকেন।

খাবার-দাবার পড়ে আছে ক'দিনের—

তা থাকে। আশেপাশের মানুষ দিয়ে যায়। ইচ্ছে হলে খান। নয়তো কাকপক্ষীর পেটেই যায়।

সাপটাপ তো থাকতে পারে রাঙাকাকা।

এ হলো গিয়ে পুরুলিয়ার জয়চণ্ডীর জঙ্গল। সাপ তো আছেই। নে চল

আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে তবে শামুকের গোলা। তখন রোদ উঠেছে। চাদ্দিকে পচা গন্ধ। সব শামুক তখনো মরেনি। তাদেরই পাহাড়। একদল লোক শামুকের ভেতর থেকে সেই মাংসটা বের করে নিচ্ছিল। ড্রাইভার লরির ডালা খুলে দিয়ে খেতে গেল। এবার লোডিং হবে। এই শামুক পুড়িয়ে চুন হবে পাকলেডাঙায়।

বিশ্বনাথ কিছু খেতে পারলো না। তার রুচি ছিল না। এই লাখ লাখ শামুক জ্যান্ত খুন করে তবে চুন? গোড়ায় মাংস কুরিয়ে তোলা। জ্যান্ত দশায়। তারপর পোড়ানো।

আপনি জানেন না? বাবা রিটায়ার হয়ে কবে কলকাতা চলে গেছেন—তা এই তিন বছর হয়ে গেল।

রিটায়ার হবেন জানতাম। কিন্তু স্যার যে কলকাতায় চলে গেছেন জানতাম না।

কলকাতা মানে—কলকাতার গায়েই সরোজিনী কলোনী—এখন আর কলোনী বলা যায় না। সবাই লোন নিয়ে—কেউ বা অবস্থা ফেরায়—যে যার দু'কাঠা তিন কাঠায় তেতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে। সেখানে আমার মেসোমশায়ের বাড়িতে থাকেন বাবা-মা। মেসোমশাই নেই তো। ওখানে থেকেই আমি মেডিকেল পড়ি।

আজ উঠি।

উঠবেন কি! আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করুন। ও রেখা—বলে গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো ঝকঝকে চেহারার বিশ্বনাথ ঘোষ এম. বি. বি. এস. পর্দা তুলে ভেতর বাড়িতে গলা পাঠালো।

থাক না। উনি হয়তো ব্যস্ত আছেন। ফিরছিলাম পাকুড় থেকে স্টোন-চিপ নিয়ে। ব্রেক কষতেই দেখি আপনার নামের সাইনবোর্ড। রোগীরাও বসে আছেন—

রোগী তো আছেই। থাকবেও। ইণ্টার্নি থাকতেই বিয়ে করে ফেললাম। আরও একটা বছর হাউস স্টাফ থেকে আর সময় নষ্ট করিনি। সিধে এই বেলেতোড় বাজারে এসে চেম্বার খুলে বসে গেছি—

ভয় করতো না? কত রকমের রোগী—

গোড়ায় গোড়ায় করতো বই কি। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো বিয়ে

করেছি। খরচ চালাবো কোত্থেকে? তার গোড়াতেই দুটি মেয়ের বাবা হয়ে পড়েছি। তার ওপর নার্সের কাজটা ছেড়ে দিয়ে ও চলে এল। রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেলাম ইণ্টার্নির পর। সেই থেকেই রোগী দেখতে বসে গেছি। কোনো দিকে তাকাবার সময় পাইনি। রেখার অ্যাকটিভ কো-অপারেশন না থাকলে এত অল্প সময়ে এই প্র্যাকটিশ গড়ে তুলতে পারতুম না। এই যে রেখা—

মাইতি বিশ্বনাথ হাত তুলে নমস্কার করলো। সফল, সচ্ছল ঘরণীর চেহারা। বাচ্চারা কোথায়?

রেখা হেসে বললো, ভেতর বারান্দায় খেলছে দু'জনে। একেবারে পিঠোপিঠি তো—

শুনলাম আপনি ওকে খুব সাহায্য করেছেন। আপনার কো-অপারেশনেই প্র্যাকটিশ জমে উঠেছে?

রেখা কিছু না বলে চুপ করে থেকে শুধু হাসলো।

ঘোষ বিশ্বনাথ বললো, ইনি বাবার খুব প্রিয় ছাত্র। তোমায় বলেছি ওঁর কথা। সেই পারুলেডাঙার বিশ্বনাথ—

রেখা মাথা নেড়ে সায় দিল।

তার স্বামী হেসে বললো, হয়তো আজ তুমি ওঁরই স্ত্রী হতে—

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। রেখাও কিছুটা তটস্থ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে ফুল স্পীডে।

আরে আমরা ডাক্তার। কোনো রসিকতাই আমাদের জিভে আটকায় না। তোমায় না বলেছি রেখা—আমরা একই দিনে জন্মে—একই হেলথ্ সেণ্টারে ছিলাম। সেখানে বদলা-বদলিও তো হয়ে যেতে পারে।

রেখার লজ্জা কাটিয়ে দিতেই মাইতি বিশ্বনাথ বললো, আমিও সময়ে সময়ে এ কথাটা ভাবি—বুঝলেন। হয়তো বদলাবদলি হয়ে যাওয়ায় আমি আজও আমার বাবার পিওর অয়েল মিলে বসে আছি। পাকুড়ে ছুটে যাচ্ছি স্টোনচিপ আনতে। টকি হাউসের জন্যে কলকাতায় গিয়ে ডিস্ট্রিবিউটরের ঘর থেকে নতুন ছবি আনছি।

আর আমি ডাক্তারি পাশ করে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে সংসার পেতেছি বেলেতোড়ে। কি বলেন!

সবই মানছি। কিন্তু এই কথাটা বলুন তো—একজন মানুষ আরেকজন মানুষ হতে পারে? হয়ে থাকতে পারে? মাইতি বিশ্বনাথ একথায়—বেলা দশটা এগারোটায় বেলেতোড়ের সদর রাস্তায় রোদ উঠে গিয়ে মেঘলা ছায়া

পড়ে আসতে শুরু হলো। আর ক'দিন বাদেই সে দিবস। তারই জন্যে পথে আসতে আসতে অনেকগুলো লাল তোরণ চোখে পড়েছে বিশ্বনাথের।

রেখা উঠে গিয়েছিল ভেতরে। পিরিচে বেলের মোরব্বা আর তক্তি সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে ফিরলো।

মাইতি বিশ্বনাথ বললো, এখন কিছু খাবো না। ড্রাইভার, ক্লিনার ওদের সঙ্গে একটু বাদেই খেতে বসতে হবে।

পিরিচখানা সরিয়ে নিতে নিতে রেখা বললো, তবে একগ্লাস সরবত করে আনি?

বেশ তো।

সরবতের গ্লাসটা শেষ করে রেখার হাতে তুলে দিতে রেখা বললো, আপনি তো বাবার প্রিয় ছাত্র। আপনি তো কলকাতায় যান বলছিলেন একটু আগে। আমার একটা কাজ করে দেবেন?

বলুন।

বাবা কেমন আছেন একবার দেখে—আমাদের লিখে জানাবেন?

নিশ্চয়। আমারও তো স্যারের খবর নেওয়া হয়নি অনেকদিন।

ঘোষ বিশ্বনাথ নিজের ঘরে চেয়ারে বসে মেঝেতে পায়ের জুতো ঘষতে ঘষতে বললো, ওকে বিয়ে করেছি বলে আমাদের মুখদর্শন করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন বাবা—

ওঁর অপরাধ?

ঘোষ বিশ্বনাথ তার বউয়ের মুখে একবার তাকালো। তারপর বললো, আমার শ্বশুরমশায় দেশভাগের আগে ওপারে ধোপা ছিলেন। সে অনেকদিন আগের কথা। এপারে এসে তিনিই সরোজিনী কলোনীর পত্তন করেন। এখনো কলোনীর তিনিই ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট। তিনিই আমার মেসোকে ডেকে এনে জায়গা দেন—তবেই না মেসোমশায় কলকাতার অমন জায়গায় লোন নিয়ে বাড়ি করতে পেরেছেন। ডাক্তারি পড়ার সময় ওখানে থাকতেই রেখার সঙ্গে আমার পরিচয়।

স্যারকে তো জানতাম ওপেন-মাইণ্ডেড্ মানুষ—

মাইতি বিশ্বনাথের একথায় ঘোষ বিশ্বনাথ বললো, বাবাকে কোনো ব্যাপারে কখনো এতখানি অ্যাডামান্ট দেখিনি। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিয়ে করলাম। প্র্যাকটিশ নিজের চেষ্টায় গড়ে তুললাম এত পরিশ্রম করে। ভাড়ায় এ বাড়িতে এসে এখন বাড়িটা কিনে নিয়েছি। একখানা

অ্যামবাসাডারও কিনেছি। কিন্তু বাবা কিছুই দেখলেন না। বাবার জন্যে মায়েরও দেখা হলো না। আমার কেনা গাড়িতে বাবা চড়লেন না—

পারুলেডাঙার বিশ্বনাথ দেখলো, প্রফুল্ল ঘোষের ছেলে—ছেলের বউ দু'জনই মেঝের দিকে তাকিয়ে। পর্দার ওপাশে ওদের রুগী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। বেলা বাড়ছে আর রোদও তেতে উঠছে।

আর কথা না বলে সে লরিতে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসলো। এই পৃথিবীর কোনো ঘটনাই অন্য ঘটনার কথা জানতে পারে না। লরি স্টার্ট নিয়ে বুদবুদের পথে পাড়ি দিল। সেখান থেকে কয়েক বস্তা ভেলিগুড় উঠবে। গরুর খাবার।

ওদিকে ঘরের ভেতর ডাক্তার বিশ্বনাথকে নিশ্চুপ দেখে রেখা বললো, আমারই জন্যে তোমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল।

সেকথায় কান না দিয়ে প্রফুল্ল ঘোষের ছেলে পর্দা সরিয়ে তার চেয়ারে এসে বসলো।

লরি পারুলেডাঙায় ঢুকলো সন্ধ্যের মুখে মুখে। সারাটা দিন লরির ড্রাইভারের পাশে বসে বিশ্বনাথ সকালের দিককার একরোখা সূর্যকে ধাপে ধাপে মোলায়েম হয়ে আসতে দেখেছে। সন্ধ্যের মুখে মুখে স্টোনচিপ বোঝাই লরি যতই শ্যামসুন্দরবাটির দিকে এগিয়ে আসছিল --ততই রাস্তার দু'ধারের চষা মাঠ আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। অনেকদিন হলো সেই লাল রাখাল তার চোখে পড়েনি। অবুঝ, অজ্ঞান একবগ্‌গা ভেড়ার পালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে হাজিপুরিয়া রাখাল। মাথাটা নেড়া। লোমছাটা ভেড়াগুলোকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। যাবার পথে তাদের আদর করে নাম দেয়। সে আদরের ডাকে ভেড়ার দল সাড়াও দেয়। শীত করলে কিংবা খিদে পেলে রাখাল কিশোর নিশুতি রাতে খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালে। সে আগুনের আভায় রাখালের খোলা পেট, নাভি লালচে হয়ে ওঠে। তখন ও ভুট্টা পোড়ায়। দু' একখানা আদরের কোনো ভেড়াকেও দেয়। লরির হেডলাইটে ভেড়ারা জেগে উঠে সে আগুন সার দিয়ে টপকায়। প্রান্তরের ভেতর।

লরি থেকে নামতে নামতে শামুক পোড়ানোর পচা গন্ধটা বিশ্বনাথের নাকে এসে ধক করে লাগে। মাথাভর্তি ধুলো। পা দু'খানা সাদা হয়ে উঠেছে স্টোনচিপের ধুলোয়। পিওর অয়েল মিলের চাতাল থেকে আলো এসে পড়েছে লরির ওপরকার স্টোনচিপে। কি বছর এই সময়টায় চুনের ভাটিতে এভাবেই

মরা আর আধমরা শামুক পোড়ে। হাসি পেল বিশ্বনাথের মহেশ্বর মাইতির চুনও পিওর চুন। ভাগ্যিস তার বাবা এখনো ভেজাল প্রমাণে কোনো পুরস্কার ডিক্লেয়ার করেনি।

হাত-পা ধুয়ে চিলেকোঠার ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় ন'টা হয়ে গেল বিশ্বনাথের। সামনে বর্ষা। আমনের বীজধান চিলেকোঠার একটেরে ঢেলে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল বোধ হয় দিনের বেলায়। তোলা হয়নি। বাবা দেখলে একেবারে অনর্থ করবে। একবার ভাবলো, রাঙাকাকীকে ডেকে তুলে দিতে বলবে। পরক্ষণেই মনে হলো—গায়ে-গতরে সারাদিন খেটে রাঙাকাকী এখনো হেঁসেলে হাঁড়িকুড়ি সামলাচ্ছে। এরপর যদি ধান তুলতে হয় তো মরেই যাবে বেচারা।

ওরই ভেতর জায়গা করে নিয়ে সে তার অভ্যেসমতো খানিকক্ষণের জন্যে ধ্যানে বসলো। এটা তার অনেকদিনের অভ্যেস। আজ নানা কারণে সারাটা দিনই মনটা উতলা হয়ে আছে। প্রফুল্ল স্যারের অমন ঝকঝকে ছেলে পসার জমিয়েও মনের অশান্তিতে ভুগছে। রেখা নামে একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে ভোগান্তির একশেষ। স্যারই বা কী ধারার মানুষ!

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই চোখ বন্ধ করে বিশ্বনাথ এক অন্ধকার নদী দেখতে পেল। তার ঢেউগুলোও অন্ধকার দিয়ে তৈরি। তাতে আবছা একটা আলোর রেখা বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেষ্টা করেও পারছে না কিছুতেই। স্পষ্ট—স্থির হতে হতে তা আবছা হয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে সেই অস্পষ্ট রেখায় মনের সবটুকু রাখতে গিয়ে কী এক খটকায় চোখ খুললো বিশ্বনাথ।

কে ওখানে? কে?

এই ক'বছরে বিষয়-সম্পত্তি দেখতে দেখতে বিশ্বনাথের গলায় আরও দাপট এসেছে। তার চোখ এখন অন্ধকারেও দেখতে পায়। মেয়েলী গলায় কে গুনগুন করে কেঁদে উঠলো। চিলেকোঠার কানাৎ অব্দি শুকোতে দেওয়া বীজধান পড়ে। সেখানটায় মাথা নিচু করে একটা অন্ধকার কাঁদছে।

একি? তুমি রাঙাকাকী?

ধামা হাতে রাঙাকাকী উঠে দাঁড়ালো। চোখে জল। তোর বাবা মাসকরা যা ধান মেপে দেন—তাতে আমাদের চারটে পেট চলে—?

আরও কি বলতে যাচ্ছিল রাঙাকাকী। কাকা আর দু'টি ছেলেমেয়েকে ধরে চারজনের সংসার। সব আলাদা করে দেওয়া আছে মহেশ্বর মাইতির। মাসকরা ধান, ডাল, সর্ষেও ধরে দেওয়া আছে। তার ওপরে কিছু হলে

মহেশ্বর মাইতির হাত গলে কিছু বেরোবে না।

তেতলা বসতবাড়ির সারাটা ছাদের অন্ধকার গুটিয়ে যেন বিশ্বনাথের মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সে আলগোছে রাঙাকাকীর হাত থেকে ধামাটা নিল। তাতে উঁচু উঁচু করে ধান গাদিয়ে মাথায় নিল। নাও—চল এবারে—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আলোয় দেখলো, হাসিমুখে রাঙাকাকী চোখের জল মুছছে। বিশ্বনাথ তেলকলে বসলে রাঙাকাকী ঠিক গদির গায়ে বড় শিশি পাঠিয়ে দেবে। হিসেব মিলমিশ করে বেলায় ফেরার মুখে সে শিশি তেলে ভর্তি করে বিশ্বনাথ রাঙাকাকীর ঘরে পৌঁছে দেয়। এক একসময়—মনে হয় তার—বাবাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। পড়াশুনো শেষ করে বিশ্বনাথের পাকলেডাঙা ফেরার পর থেকে মহেশ্বর মাইতির বিষয়-আশয়ে টানটা যেন আরও জোরালো হয়ে পড়েছে।

এক একদিন খেতে বসে মহেশ্বর বলে—বুঝলি বিশে—হালদারদার পুকুরটা কিনলাম। কিংবা বলে—নিয়ে নিলাম। পাড় ধরে সাতাশটা ফলবতী নারকেল গাছ।

এসব কথার ভেতর বাবার মুখে কী করে যে 'ফলবতী' কথাটা চলে আসে তা ভেবে পায় না বিশ্বনাথ মাইতি বি. এস-সি (হনস্)।

রাঙাকাকীর ঘরে ধামাটা নামিয়ে দিয়ে একা একা আবার চিলেকোঠার ঘরে উঠে এল বিশ্বনাথ। তার বাবাই মা-মরা দুই কাকাকে বড়টি করেছে একথা ঠিক। কিন্তু একথাও তো ঠিক—ফুটো পয়সার মহেশ্বর মাইতিকে গায়ে-গতরে পেটে ভাতে খেটেই না তারা আজকের মহেশ্বর মাইতি মশায় করে তুলেছে। তবু বাবা মাসকরা ধান, ডাল, সর্ষে, নুন আলাদা করে মেপে দিয়ে মাসকে মাস কড়ার করে রাখে!

টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। অন্ধকার সেই বৃষ্টিপাতেরও যেন একটা সামান্য শব্দ পায় বিশ্বনাথ। আর ক'দিন বাদেই দেশসুদ্ধ লোক বীজধান ভিজিয়ে বীজতলা করবে। সেই দামী ধান সে এই মাত্র রাঙাকাকীর ঘরে একধামা বয়ে দিয়ে এসেছে।

বৃষ্টিতে পোড়া শামুকগুলো ভিজে বাতাসে উৎকট এক গন্ধ ছড়িয়ে দিল।

আজই সে দেখে এসেছে—ডাক্তারি পড়ে বিশ্বনাথ ঘোষ এই পৃথিবীর বুকে তার নিজের একটা পরিচয় গড়ে তুলতে পেরেছে। তাদের দু'জনের বয়সও এক। সে শুধু বাবার তেলকল, ছবিঘর, তামাকের গদি, ইমারতী স্টোর্স আর বাজার দেখে। রাশ সব সময় ধরে আছে সেই মহেশ্বর মাইতিই।

আড়ালে আবড়ালে। এ আমি কি করে চলেছি? না পড়লাম এম. এস-সি। না আমি প্রফুল্ল স্যারের মতো কোনো আদর্শ সামনে রেখে জেলে যেতে পারলাম। রোজ একটু একটু করে বাবার তেলকলে সর্ষে হয়ে যাচ্ছি। কিছুদিন বাদে পাকলেডাঙার মানুষজন আমাকেও পিওর অয়েল মাইতি বলে ডাকবে। এর ভেতর বসে ঈশ্বর আছে কি নেই—এ নিয়ে মাথা ঘামায় পাগল! তবু চোখ বুজলে আমি আজও কোনো আবছা মতো বিশাল প্রাঙ্গণ দেখতে পাই। দিগন্ত অব্দি গড়ানো সে প্রাঙ্গণ। তার শেষ প্রান্তে ঢলে পড়া মেঘ থেকে ফাঁক মাত্র হাত খানেকের। সেই ফাঁকে আকাশের যা-কিছু দেখা যায়। সেখানে এখন না আছে আকাশ, না আছে আলো।

বেশি রাতে খেতে বসে বিশ্বনাথ বললো, আমি ডাক্তারি পড়বো।

বিশ্বনাথের মুখে না তাকিয়ে মহেশ্বর বললো, ডাক্তারি পড়ে গরীবের ছা। আর পড়ে যার খুব অভাব। পড়ে পাশ দিয়ে টাকা আয়ই তার আদত কথা।

এসব ভুল কথা বাবা। ভাল ভাল স্টুডেন্টরাই ডাক্তারি পড়ে। আমাকেও পড়তে গেলে পরীক্ষা দিয়ে সিট পেতে হবে। ডাক্তারি পাশ করে মানুষের সেবা করা যায়।

পাকলেডাঙার মোড়ে সব ডাক্তার চেম্বার খুলে সেবা করছে?

আমি যদি সিট পাই—তাহলে পাশ করে মানুষের পাশে দাঁড়াবো।

আর দাঁড়াতে হবে না! যা করছো তাই খায় কে! তেলকল, ছবিঘর, তামাকের গদি, ইমারতী স্টোর্স, বাজার—সব তোমায় বুঝে নিতে হবে বাবা। তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নাও। এইসব নাড়াচাড়া করে যা পাবে—তাই আগে রাখো। তখন ইচ্ছে হয়—দেশসেবার জন্যে তিন নাইট যাত্রা দাও। কে আটকাচ্ছে?

এসবের ভেতর আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তোমার কারবার তুমিই সামলাও।

হা হা করে হেসে উঠলো মহেশ্বর। তা কি হয়। তুমি হলে গিয়ে আমার ছেলে। আমি মরলে তুমিই মুখে আগুন দেবে বাবা। এ যে সে অধিকার নয় রে বিশে! কড়ায়গণ্ডায় সবই তোকে বুঝে নিতে হতে। সামনের বছরই তেলকলের ফিলটারগুলো পালটাবি।

আমায় ছেড়ে দাও বাবা। আমি আর পারছি না।

উঁহু। অস্থির হোসনে। তোর জন্যে আমি একটা রাস্তা বের করেছি।

কি রাস্তা?

ভাখো বাবা। কারবারের চরিত্র বছর বছর পাল্টায়। পাকলেড আজ এক বড় গঞ্জ এলাকা। ট্রেনে বাসে সোজা যোগাযোগ সব সময়। আশেপাশে গাঁ-গেরামের মানুষজনও পাকলেডাঙার দিকে তাকিয়ে থাকে। নতুন কি এল? নতুন কি হলো?

কি বলতে চাইছো বাবা?

এখানে কোনো ভাল কাপড়ের দোকান নেই। বিশেষত মেয়েদের সাজ-সজ্জার জন্যে এখনো মানুষ বর্ধমান ছোটে। একটা ভাল ব্লাউজ পাওয়া যায় না। তোমায় দিয়ে আমি একটা বড় কাপড়ের দোকান দেবো।

পাগলা হয়েছো!

উঁহু। আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে বাবা। জায়গা দেখেছি বাজারে। বড় শো-রুম থাকবে। থাকবে শাড়ির সঙ্গে হাজার রকমের ব্লাউজ।

ক্ষেপেছো?

একদম না। এসব টুকিটাকি জিনিসেই কিন্তু ফ্যান্সি প্রফিট থাকে। আর তা সফল করতে চাই গেলস্ গার্ল।

সেলস্ গার্ল? পাকলেডাঙায়? সে তুমি কোথায় পাচ্ছো?

মহেশ্বর মাইতি আটঘাট বেঁধেই নামে বাবা। তোমায় আমি ভাল করে বাঁধছি। একটা মডার্ন মেয়ের সঙ্গে তোমার বে দেবো। বৌমাই মেয়েদের জিনিষপত্তরের বিক্রি-বাটা দেখবে। তুমি শুধু মাথাটি আঁচড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে কাপড়ের দোকানের ফরাসে হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকবে। দেখবে সেল কাকে বলে! এ তো দর্ষে পিষে তেল বের করা নয়!

বিশ্বনাথ বুঝলো, তার বাবাকে এখন কিছু বোঝাতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বললেও কানে নেবে না বাবা। সে তার কারবারের নিত্য-নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। আস্তে বললো, অমন মেয়ে পাচ্ছো কোথায়?

সে ভাবনা আমার। ঘটকরা বসে নেই।

পরদিন ভোর ভোর হাঁটতে বেরিয়ে ক্যানেলের গায়ে ফেলা মাটির ঢিবিতে উঠে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। সূর্য দেখা দেওয়ার আগে আগাম আলো পাঠায় পৃথিবীতে। দুনিয়ার সবটা একসঙ্গে দেখার কোনো উপায় থাকলে বিশ্বনাথ ঠাণ্ডা নরম আলোয় এই দুনিয়াটা ভাল করে দেখে নিত। ভোরের ফার্স্ট ট্রেনটা রওনা হবার জন্যে হাঁসফাঁস করছিল।

এমন সময় ক্যানেলের হাঁটুজল ছপছপ করে ভেঙে এদিককার তীরে উঠলো মাঝবয়সী একজন মেয়েলোক। মাথাটা কাঁচাপাকা। হাতে পাঁচন। মুখ-

খানা—ঠিক চাষীবাসী ঘরের মেয়েদের মতো নয়। আবার একদম যে শহুরে—তাও নয়। শাড়ির আঁচলটাই ভাল করে পিঠে ফেলা। পায়ে পায়ে গুটি কয় পাঁঠা ছাগল।

চেনা পরিচিত মানুষের ধারায় কথা জুড়ে দিল বিশ্বনাথ। চরাতে না গেছলে?

হ্যাঁ বাবা। এখন তো সারা মাঠ চষা-চষির সময়—অবলা জীবগুলো যায় কোথায় বল তো? খায় বা কি?

তা ওদের খাইয়ে আনলে?

হ্যাঁ। খালধারের নাবাল ঘেঁষে যেখানে যা-কিছু ঘাস-পাতা—তাই এখন ওদের খাবার।

ভোরবেলার নরম আলোয় সবে চষা আস্ত মাঠখানার বুক আগাগোড়া কালো দেখাচ্ছে। ক্যানেলের কানাৎ ঘেঁষে মেয়েলোকটির কুঁজিঘর। তবে শক্তপোক্ত পাকা মতন।

তুমি কে গো? আগে তো দেখিনি কোনোদিন—

থতমত খেয়ে বিশ্বনাথ বললো, আমি এখানকার নই।

তাই বল। বি. ডি. ও. অফিসির?

ঠিক ধরেছো।

আমার একটা উবগার করে দেবে বাবা? ওই ধাড়ি ছাগলটার সামনের পায়ের ক্ষুরে এষো হয়েছে। নড়তে চড়তে আছাড় খায়। অথচ ভরা পোয়াতি—

বিশেষজ্ঞের ঢঙে বিশ্বনাথ উবু হয়ে বসে ছাগলটার সামনের ডান পা আলোয় তুলে ধরলো। দুই ক্ষুরের মাঝখানটায় ফোলা—যেন রক্ত শুকিয়ে লাল মিছরির দানা হয়ে আছে। মুখে বললো, চিন্তা করো না। ওষুধ পাঠিয়ে দেব'খন। এখনকার মতো উনুনের ছাই ছিটিয়ে দাও। তাহলে পোকা-মাকড় বসতে পারবে না।

এরপর ঢিবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিশ্বনাথ দেখলো, তার বাবার কাদা খুব মন দিয়ে ধাড়ি ছাগলটার ক্ষুরে ছাই মাখাচ্ছে। ঘুঁটের ছাই। এই সেই বিখ্যাত কাদা। যার কাছে তার বাবার যাতায়াত আছে। ঠারে-ঠোরে রাঙাকাকী—ছোটকাকী একথা দু'একবার বলেও ফেলেছে তার সামনে। দেশ-গাঁয়ের আর পাঁচটি মেয়েমানুষের মতোই। মায়া, দয়া, সাহস আর ঘোঁট পাকানোর বুদ্ধি নিয়ে মেয়েমানুষ যেমন জন্মায়—ঠিক তাই।

এই ক'বছরে পারুলেডাঙায় ফেরার পর বিশ্বনাথ অনেক কিছুই দেখতে শিখেছে। সর্ষের খোসা উঠে গেলে ভেতর থেকে তেল ঝরে। মানুষের সারাটা সংসার যেন অবস্থা বিপাকে অবিরাম ঘানির গদায় পেষাই হয়ে তেল ঝরাচ্ছে।

ক্ষুরের ফাঁকে এযোর জায়গায় ছাই পড়ায় বুঝি-বা কিছু আরাম হলো। ছাগলটা পটাং করে দাঁড়িয়ে উঠে কাদাকে ঢুঁসোতে গেল।

আনন্দে—আবেগে দু'হাত বাড়িয়ে কাদা ছাগলটাকে ধরতে গেল।

ঢুঁসোনো ভুলে গেছে ছাগলটা। কাদার দু'হাতের ভেতর গলা তুলে ধরলো। অমনি কাদা গলার নিচে সুড়সুড়ি দিয়ে আঙুল বোলাতে শুরু করলো। আরামে ছাগলের চোখ বুজে এসেছে। চষা—কালো রঙের সারাটা মাঠের কাগজখানায় যেন সাদা রঙের ছাগলটাকে কে এইমাত্র এঁকে রেখে গেছে। কাদার দু'খানা হাত সেই আঁকা ছাগলের গলায়।

মাটির চাপড়া-ওলটানো চষা মাঠে আর ক'দিন পরেই ফিরতি হাল পড়বে তারও পরে আরও একবার। তখন পারুলেডাঙার আকাশ জুড়ে মেঘ নেমে এসে জল ঝরাবে। বীজতলা ভেঙে সবাই রোয়া কাজে নামবে মাঠে। এখন মাঠের ওপারে দূরে কোনো অজানা গাছের ফাঁকে-ফোকরে ভোরবেলাকার শান্ত—আবছা দিগন্ত দেখা যায়।

সেদিকে তাকিয়ে থাকলো বিশ্বনাথ।

সরোজিনী কলোনী আগে ছিল কলকাতার গায়ে। এখন কলকাতা হু হু করে এগিয়ে যাওয়ায় কলোনীটা পড়ে গেছে কলকাতার তলপেটে। কাছেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়—তার ক্যাম্পাস। পুব দিকে নতুন গজানো আইন কলেজ। পেছনে সরকারী টাউনশিপ। সামনে একদা সুলভে কেনা জায়গায় এখনকার মহার্ঘ সম্পন্ন বসতি। এই কলোনীতে দাঁড়িয়ে সেই বসতির তরুবীথি হর্ম্যরাজি চোখে পড়ে।

স্বাধীনতার পর এই চল্লিশ বছরে মাঝের নাইডু কথাটা হারিয়ে সরোজিনী কলোনী এখন ডাকসাইটে মহল্লা। দু'কাঠা সওয়া দু'কাঠার প্লটে যেমন তেতলা চারতলা উঠেছে—আবার চল্লিশ বছর আগে ডোলের টাকায় তোলা ছেঁচা বেড়ার কুটিরও আছে। পোস্টাল অ্যাড্রেসে এখন আর কলোনী কথাটাও লেখার দরকার পড়ে না। বারোর দুই সরোজিনী, কলকাতা—লিখলেই চিঠি এসে যায়।

সেই বারোয় দুইয়ের বাড়িটির একতলার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকের ওপর টেবিল ক্লকে সাড়ে ন'টা। বৃষ্টি সবে এক পশলা শেষ হয়েছে। আকাশের মেঘে আরেক পশলার আভাস। এলোমেলো করে বানানো দোতলা তেতলার বারান্দা—জানলায় ভিজে কাপড়-চোপড় ঝুলছে। বাইরে দূরে বেলাবেলি কলকাতা এখন একদম ভিজে। যদি বা একটু শুকোয় তো আবার বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেয়।

সরোজিনীতে ওপার বাংলার সব দেবস্থানই আবার গড়ে উঠেছে। বরিশালের কালী, ফরিদপুরের নীল সরস্বতী, যশোরের দুর্গাবাড়ি, ঢাকার রামেশ্বরী খুলনার শিববাড়ি—সবই এখানে ঘিরে যে যার মতো প্রতিষ্ঠা করেছে। বলা যায়, বসতিটা অনেক মানুষের স্মৃতির পুঁটুলির আণ্ডিল।

ওরই ভেতর খোলা জানলা দিয়ে দেখা গেল—টেবিল ক্লকের কাঁটায় চোখ রেখে ছিমছাম এক ভদ্রলোক নিজের কব্জির ঘড়ির কাঁটায় তাকালো। তার কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। পাঞ্জাবির শেষ বোতামটাও আটকানো। হাতে গোটানো ছাতা। পায়ে পাম্পশু।

কলমটা ফেলে যাচ্ছেন জামাইবাবু—

প্রফুল্ল ঘোষ ফিরে তাকালেন। দে—বলেই তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, আমি বলছিলাম কি রানী—তুই তো বাড়ি বসে থাকলি দুটো বছর—এবার এম. এ পরীক্ষাটা দে। নোটস পাওয়া যাবে। তারপর বি. টি. দে। কলকাতার কাছাকাছি কোনো স্কুলে ঠিক কাজ পেয়ে যাবি। বি. এ-তে তো অনার্স ছিল তোর।

আমার কথা পরে ভাবার সময় পাবেন জামাইবাবু। দেখুন আজও জয়েন করতে দেয় কিনা।

তাও মন্দ বলিসনি। এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে জয়েন করবো বলে গেলাম। এক হাতে হেডমাস্টারির অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট—আরেক হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার—তবু সই করে জয়েন করতে দেবে না? দেখি আজ আমায় আটকায় কে?—বলতে বলতে প্রফুল্ল ঘোষ রানীর দিকে তাকালেন। চোখ ছোট হয়ে এল। শান্ত গলায় বললেন, রানী—এরকম শাড়ি আর পরবে না তুমি। পাড় খুঁজে পাওয়া যায় না—

আমিও কি ভেবেছিলাম—ও এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে! বিধবার এই বেশই ভাল।

না। তুমি সেজেগুজে থাকবে। পড়াশুনো করবে।

ও তাই চাইতো, কিন্তু নিজেই চলে গেল। একটু থেমে রানী বললো, আপনিও কি ভেবেছিলেন—রিটায়ার করেও চাকরি খুঁজে ইন্টারভিউ দেবেন—জয়েন করতে যাবেন—গিয়ে ফিরে আসবেন—আবার যাবেন!

আমার কথা বাদ দে রানী।

বিশ্বনাথের তো শুনি ভাল পসার। একবার এসে দেখেও তো যেতে পারে আমাদের। ডাক্তারি পড়ার সময় এখানেই তো ছিল।

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো রানী। কিন্তু আসবে না। আমি আছি যে এখানে! চলি—বলেই রাস্তায় নেমে জানতে চাইলেন, তোর দিদি কোথায় রে?

রান্নাঘরে। কী যেন বানাচ্ছে। এলাচ গুঁড়ো করে দুধে দিল তো দেখলাম। ডাকবো?

নাঃ! সারাজীবন বসে বানাক!!

শেষের কথা ক'টি প্রায় বিড়বিড় করে বললো প্রফুল্ল ঘোষ। পেছন থেকে তার কিছুই শুনতে পেল না রানী দত্ত। ঈশ্বর লোকেন দত্তের ধর্মপত্নী। উপস্থিত বারোর দুই সরোজিনীতে এই তেতলা বাড়ির নিব্যূঢ় মালিক।

বড় রাস্তায় পড়ে মিনিবাস পেয়ে গেলেন প্রফুল্ল ঘোষ। অনেকদিন আগে অল্পবয়সে তিনি বাঁকুড়া—দামোদর রেলের প্রায় সব স্টেশনেই কোনো না কোনো স্কুলে পড়িয়েছেন। তখন তাঁর পোস্টের নাম ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। সেহেরাবাজার, ইন্দাস, বুলবুলচণ্ডী, ডোরকোণা, রায়না—সব জায়গার সেকেণ্ডারি স্কুলেই তিনি কাজ করেছেন। চাকরি পাকা ছিল না তাঁর। কখনো কারো ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে ঢুকে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কখনো বা স্যাংশন হবে এই আশায় তৈরি পোস্টেও তিনি ঢুকেছেন—অবিশ্যি কিছু কম মাইনেতে।

কড়ার থাকতো—পোস্টটা স্যাংশন হয়ে গেলেই তিনি পুরো মাইনে পাবেন।

পরে অবশ্য এই উড়নচণ্ডী দশা তাঁর ঘুচে যায়—যখন মহারাজরা তাঁকে তাঁদের স্কুলে ডেকে নিয়ে নিলেন। প্রফুল্লের যাতায়াতের কষ্ট দেখে ওঁরা কোয়ার্টারও দিলেন। বেশ সুখেই কেটেছে প্রফুল্ল ঘোষের ওঁদের ওখানে। ঠিক ছিল—ছেলেটা চেম্বার করে বসলে রোগীর ভিড় হলেই তিনি স্কুলের কোনো কাজে আর যাবেন না।

বেকবাগানে নেমে তিনি তালতলার বাস ধরলেন। দাঁড়ানো যায় না।

বেজায় ভিড়। রিপন নার্সিং হোম ছাড়িয়ে একটা স্টপ আসতেই প্রফুল্ল ঘোষ নেমে পড়লেন। বৃষ্টিভেজা ঘেমো রোদ্দুর। পুরনো সব বসতবাড়িতে ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ের কারখানা, টায়ারের দোকান—বারান্দা ঢেকে নিয়ে লুঙ্গি আর গামছার কারবার। স্কুলটা একদম গেরস্থপাড়ার ভেতর। অনেকদিনের স্কুল। এর ওর বাড়িতে ভাড়ায় থেকে থেকে বড় হয়েছে। এখন অবশ্য একটা কেনা বাড়িতেই স্কুল বসে। জায়গার অকুলান। তাই ডেভলপমেণ্ট ফি ইত্যাদি নিয়ে উত্তরের বারান্দা বরাবর এক্সটেনশন চলছে। ইণ্টারভিউ দিতে বসে কথায় কথায় এসব কথা শুনেছেন প্রফুল্ল ঘোষ। তিনি ঠিক করে-ছিলেন—জয়েন করেই এক্সটেনশনের দিকটায় অফিস স্টাফদের নিয়ে যাবেন। পড়াশুনোর ক্লাশগুলো নিয়ে আসবেন—যেদিকটায় ঘরদোর বাড়াবার শব্দ-টব্দ নেই—সেদিকে।

আজ তিনি জয়েন করবেন বলেই গোঁ ধরে এসেছেন। ফাটা ফুটপাথে ভাঙা কলের জলে ভাসাভাসি। এলোমেলো করে ওপরদিকে তোলা বাড়িটার ভেতর এখন একটা বিজবিজ ধরনের আওয়াজ উঠছে। খোলা থাকলে যে কোনো স্কুল থেকে যে চাপা আওয়াজ বেরোয় আর কি।

দূর থেকে প্রফুল্ল ঘোষকে আসতে দেখে স্কুল-গেটে দাঁড়ানো দারোয়ান ছুটে এল। তাঁর হাত থেকে ব্যাগ আর ছাতা নেবে বলে। হাসি হাসি মুখে প্রফুল্ল ঘোষও এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ঠিক গেটের মুখেই খটখটে শুকনো রাস্তা ফুঁড়ে জনা পাঁচ ছয় পেশাদার শ্লোগানধারী দাঁড়িয়ে গেল।

তারা গেট আটকে চেঁচাতে লাগলো।

হেডমাস্টারের পদে বে-আইনী নিয়োগ—

চলবে না। চলবে না॥

সঙ্গে সঙ্গে গলির মুখের সব জানলা খুলে গেল। বসতবাড়ির মানুষজন লোহার গ্রিল ধরে গেটে তাকিয়ে। স্কুল থেকেও কচি কাঁচারা জানলায় এসে দাঁড়ালো।

প্রফুল্ল ঘোষ চেঁচিয়ে বলতে চাইলেন—আপনারা ভুল করছেন। আমি ইণ্টারভিউ দিয়ে রীতিমতো সিলেক্টেড্ হয়ে তবে এসেছি।

তাঁর গলা ডুবিয়ে দিয়ে শ্লোগান উঠলো—

বাইরে থেকে হেডমাস্টার আমদানি—

চলবে না। চলবে না॥

প্রফুল্ল ঘোষ গলার শিরা ফুলিয়ে বললেন, আমায় ঢুকতে দিন—আমায়

আমার ডিউটিতে যেতে দিন—

কোত্থেকে দুটি ছেলে ছুটে এল। তাদের হাতে আটা মাখানো খবরের কাগজে লেখা পোস্টার। তারা প্রফুল্ল ঘোষকে ধাক্কা দিয়ে স্কুলের দেওয়ালের দিকে গেল।

পড়ে যেতে যেতে প্রফুল্ল ঘোষ দেখলেন, চারদিকের বাড়ির জানলায় মানুষজন। বারান্দায় বারান্দায় লোক। কিন্তু কেউ কাছে এগিয়ে এল না। ছড়িয়ে পড়া ব্যাগ আর ছাতা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রফুল্ল ঘোষ।

কাঁধের চাদরটা সপাটে একবার ঝেড়ে নিলেন। ধুলো লেগে গিয়েছিল।

তখন পোস্টারটা দেওয়ালে সাঁটা হয়ে গেছে। অসহায় দারোয়ান স্কুল-গেটের ভেতরে। দু'একটি ছাত্র বেরিয়ে এসে পোস্টারটা পড়ছে

পল্লীর শান্তি বজায় রাখতে
প্রকৃত প্রার্থীকে নিয়োগ
করতে হবে।

—শান্তি কমিটি

প্রকৃত প্রার্থী! কথাটা বিড়বিড় করে বলেই প্রফুল্ল ঘোষ হাতের ছাতাটা উঁচু করে চেঁচাতে লাগলেন—

শান্তি? কিসের শান্তি! গাজোয়ারি পেয়েছো তোমরা।

ওদের একজন এগিয়ে এসে বললো, ফের যদি তুমি তুমি শুনি—বলতে বলতে হাত তুললো ছেলেটি।

তাহলে কি বলতে হবে?

ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে পারেন না—

প্রফুল্ল ঘোষ ঘেমো রোদে একদম নেয়ে উঠেছেন। ধুতি পাঞ্জাবি ধুলো আর ঘামে যেন ভারি পাথর। একবার মনে হলো—স্কুলের উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক'জন মাস্টারমশাই অসহায় চোখে তাকিয়ে।

প্রফুল্ল ঘোষ দাঁড়াতে পারছিলেন না। চারদিক থেকে লোকজন তাকিয়ে না থাকলে তিনি শুয়ে পড়তেন। ওই পিচরাস্তাতেই। মনের সব জোর এক জায়গায় করে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, আমাকে জয়েন করতে দিতেই হবে। আমি যাচ্ছি—কিন্তু ফিরে আসবো—

তাঁর চলে যাওয়া দেখে পেছনের স্লোগান থেমে গেল। তার বদলে চলে যাওয়া প্রফুল্ল ঘোষের পেছনে পেছনে ওরা হাসির গররা গড়িয়ে দিল।

পড়ে গিয়ে হাতঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটা চোট খেয়ে থাকবে। কিংবা ঝাঁকুনি। নয়তো বন্ধ হয়ে যাবে কেন?

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতর সরোজিনীতে ফিরে প্রফুল্ল ঘোষ দেখলেন—সামনের দরজা হাট করে খোলা। বেলা এখন সওয়া একটার মতো। এখন আবার কে এল?

কাউকে কিছু জানান না দিয়ে বারান্দায় ফেলে রাখা তক্তপোশে এসে বসলেন প্রফুল্ল ঘোষ। কাঁধের চাদর, ছাতা, ব্যাগ রেখে গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলতে যাবেন, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা চেনা গলা ভেসে এল।

পাঞ্জাবি খোলা হলো না প্রফুল্ল ঘোষের। বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বললেন কে? বিশ্বনাথ এসেছো? আমি জানতাম—

বিশ্বনাথ মাইতি বারান্দায় বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে রানী দত্ত।

এ কি স্যার? আপনি তো ভিজে গেছেন। হাতে কাদা কাদা—পড়ে গিয়েছিলেন নাকি? রাস্তা যা কলকাতার—

প্রফুল্ল ঘোষ ওসব কথায় কান না দিয়ে এবার গায়ের ভিজে জামাটা খুলে ফেললেন। তারপর গেঞ্জিটা। আমি জানতাম বিশ্বনাথ—তুমি একদিন আমার খোঁজ নিতে আসবে। যে করেই হোক আসবে—

ঠিকানা জানতাম না তো।

কোত্থেকে জানলে?

বিশ্বনাথ দেখলো, তার স্যারের শালীর মুখখানা থমথমে, গম্ভীর। কোনো কথা না বলে মহিলা তার জামাইবাবুর ভিজে জামা, ছাতা, ব্যাগ তুলে নিয়ে ভেতর বাড়ি চলে গেল।

ডক্টর ঘোষ ঠিকানাটা দিলেন—

খচ করে ঘুরে তাকালেন প্রফুল্ল ঘোষ। তারপর বললেন—তা ডাক্তারবাবু কেমন আছেন?

খুব পস্তার স্যার।

হুঁ।

আপনারাও তো বেলেতোড় গিয়ে থাকতে পারেন।

হুঁ।

এবার চুপ করে গেল বিশ্বনাথ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, কলকাতায় এসেছিলাম ডিস্ট্রিবিউটরের ঘর থেকে ছবি নিতে—নতুন ছবি—

সবই ছায়াছবি বিশ্বনাথ। কত ছবি যে চোখের সামনে থেকে বদলে

যাচ্ছে। চলচিত্র তো!

বিশ্বনাথ মাথা নিচু করে বললো, আজও ওরা ঢুকতে দিল না স্যার?

শুনেছো সব?

উনি বলছিলেন—গুরুমায়ের বোন বলছিলেন—

তোমার গুরুমায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অল্পক্ষণের জন্যে। রাবড়ি করেছেন ঘরে। তাই খেতে দিলেন—

আবার রাবড়ি—? বলেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। কিন্তু আপনাআপনি থেমে গেলেন।

দু'জনেই একথা সেকথায় বিকেল এসে গেল। রানী দত্ত একসময় এসে ইজিচেয়ার পেতে দিয়ে গিয়েছিল। তাতে শুয়ে শুয়েই কথা বলছিলেন বিশ্বনাথের স্যার। একসময় দেখা গেল—প্রফুল্ল ঘোষ ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কলকাতার বাসাবাড়ির আকাশে তখন ভাঙা মেঘ পড়ন্ত রোদে লাল।

একটু পরে সন্ধ্যে এল। কাউকে কিছু না বলে বিশ্বনাথ চলে যাচ্ছিল। ঘুম চোখে তাকে থামালেন প্রফুল্ল ঘোষ। দাঁড়াও—

বিশ্বনাথকে একা রেখে প্রফুল্ল ঘোষ ভেতরে গেলেন। তখন সূর্যাস্তের আগেকার আলোয় আকাশটা লালে লাল। সরোজিনী কলোনীর নানান মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা। পৃথিবী ঘিরে প্রাচীন গোধূলি নেমে আসছিল।

এই নাও। তোমাকে দেবো বলে রেখেছিলাম।

বিশ্বনাথ দেখলো, খালি গায়ে প্রফুল্ল স্যারের বুকের ভারে কোমর থেকে শরীরটা বেঁকে খানিক নুয়ে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে বইখানা নিল।

টলস্টয়ের রেজারেকশন। মস্কোয় ছাপা। পড়ে ছাখো—কী সুন্দর অনুবাদ—

সাদা সর্ষেটা আসে উত্তরপ্রদেশের পূর্বী জেলাগুলো থেকে। সাধারণ সর্ষের সঙ্গে সাদা সর্ষের পাইল দিয়ে তবে পিওর অয়েল মিল তেল বের করে। ঠাকুর দেবতার ছবি আনলে টানা তিন সপ্তাহ হাউসফুল। বাজারের আট-চালার টিনটা পালটানো দরকার। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তেতলায় জানলায় দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ দেখলো, পাকুলেডাঙা স্টেশনের ওপারে ধেনো মাঠ অঝোর বৃষ্টিতে ঢেকে যাচ্ছে। এখন ভরা বর্ষার বেলা দশটা—কী বড়জোর

সাড়ে দশটা। বৃষ্টির ছাঁটের ভেতর কাদা নামের সেই মেয়েলোকটির ঝুপড়িও ঢাকা পড়ে গেল।

ক'দিনই জোর বৃষ্টি যাচ্ছে। পাকলেভাঙার রাস্তায় লোকজন কম। ছোট লাইনের ইঞ্জিন গাড়ি নিয়ে আসে যায়—ধুঁকতে ধুঁকতে। তেলকলের সামনে সদর রাস্তাটা জলমাখানো ধুলোয় কাই কাই দশা।

রেজারেকশনের সেই জায়গাটায় এসে বিশ্বনাথ খুব আস্তে আস্তে পড়ছে। বিচারপতি নুস্নোদোভ্ চিনতে পেরেছে আসামী মাশলোভাকে। যৌবনে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে এই মাশলোভার সে সর্বনাশ করেছিল। এখন মাসলোভা ঘাগু কয়েদী। বিচারপতির ভেতরে অনুতাপ জেগে উঠেছে। সে মেয়েটিকে কিছু শাস্তি দিতে চায়। মাশলোভা তার কোনো কিছুই নিচ্ছে না। সবই ফিরিয়ে দিচ্ছে। তবু বিচারপতি তার পেছন পেছন চলেছে সাইবেরিয়ায়। বিচারপতির আকৃতি, মেয়েটির ফিরিয়ে দেওয়া, সাইবেরিয়ার দীর্ঘ পথে কয়েদীদের লম্বা লাইন—সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দমবন্ধ অবস্থা। সামনে শীত। কয়েদীদের গায়ে সামান্য জামাকাপড়। আর বিচারপতি নুস্নোদোভ্ আসন্ন শীতের জন্যে সুসজ্জিত।

বিশ্বনাথ আর পড়তে পারলো না। বইখানা বন্ধ করলো। দূরে বুলবুল চণ্ডী থেকে ট্রেনটা আসছে। এ ট্রেনের এখন সবই মুখস্থ বিশ্বনাথের। সেহেরা বাজার থেকে আসে হাঁড়িকুড়ি। রায়না থেকে খদ্দেসরী গুড়। ইন্দাস থেকে আসে দুধ, ছানা। পাকলেভাঙার দিক থেকে যায়ও অনেক জিনিস ওদিকে। পৃথিবীর গায়ে নানান সাজসজ্জার নাম আসলে শীত গ্রীষ্ম, রোদ, বৃষ্টি। হু হু বর্ষার ভেতর একটা ট্রেন আসছে পাকলেভাঙায়। দূর থেকে তার বাঁশী। হঠাৎ আচমকা কী হলো—বিশ্বনাথের কাছে পাকলেভাঙার সরু পাটির রেললাইন আর সাইবেরিয়া যাওয়ার বরফকাদা রাস্তা একদম একাকার হয়ে গেল।

সে পরিষ্কার দেখতে পেল—সে পাকলেভাঙার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাশলোভার কাছে ক্ষমা চাইছে। হাঁটতে হাঁটতে মাশলোভা তাকাচ্ছেও না। মাঝে মাঝে ঘেন্নায় থুথুর পিচ কেটে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। বিশ্বনাথের গলার ভেতর ক্ষমা পাওয়ার জন্যে অসম্ভব এক আকৃতি। সাইবেরিয়া যাওয়ার পথটা তার বাবার মেয়েমানুষ কাদার ঝুপড়ির গা দিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকেই দিগন্ত অব্দি বরফঢাকা কালো মাটির রাস্তা। সে রাস্তায় কয়েদীর লম্বা লাইন।

বিশ্বনাথ নিজের অজান্তে কেঁদে ফেললো। যাকে বলে বিস্ফারিত—তাই হলো তার ঠোঁট। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর এক আনন্দে তার শরীরের ওপরদিককার চামড়া বেলুনের কায়দায় পাতলা হয়ে গেল। আর সেই চামড়ার ঠিক তলা দিয়ে কান্না-মেশানো এক আনন্দ ঢেউ হয়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে নেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। যেখান দিয়ে আনন্দ যাচ্ছিল—শরীরের সেই জায়গাটা, সেই মুহূর্তটুকু ঢেউ হয়ে ফুলে উঠছিল।

এর পরেই নিজেকে খুব নিঃস্ব লাগতে লাগলো বিশ্বনাথের। তার বুক খালি করে ওই কয়েক সেকেণ্ডে কী যেন চলে গেছে। আর তা আসবে না। অথচ সারাটা মন জুড়ে অসহ্য আনন্দের স্মৃতি রয়ে গেছে। এই স্মৃতির পাশে পাকুলেডাঙা তো তুচ্ছ। মায়ের কথা কিছুই মনে থাকার কথা নয় তার। বাবা মহেশ্বর মাইতি এখন তার কাছে কেউ নয়। এই তেলকল—ওই বাজার—এসবই তার কাছে এখন বাহুল্য বোধ হয়। এসবে তার কি কোনোদিন কোনো দরকার ছিল।

আগাগোড়া ভিজে ট্রেনটা এসে পাকুলেডাঙায় দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের মন বলে উঠলো, আহারে! কতদিন তাকে দেখা হয় না। সে এক মাঠ পার হয়ে আরেক মাঠে চলে যাচ্ছে। তার পায়ে পায়ে ভেড়ার পাল। যারা আসার পথে গায়ের লোম জমা দিয়ে এসেছে পশমকলে। যারা রাত হলে গুটিসুটি মেরে এমনভাবেই মাঠের ভেতর শুয়ে পড়ে যাতে কিনা সে শুলে কিছুটা গরম পায়। তবু যদি শীত করে, কী খিদে পায় তো সে ওরই ভেতর খড়কুটো জড়ো করে আগুন লাগায়। সে আগুনের আভায় তার নাইকুণ্ডলী, বুক, ন্যাড়া মাথাটাও লালচে লাগে দূর থেকে। বিশ্বনাথের লাল রাখাল। যার কথা বিশ্বনাথ কোনোদিন কাউকে বলেনি। লাল রাখাল। যার যাওয়ার ধরনটা অন্যমনস্ক—কিন্তু নিশুতি রাতের তারা ধরে ধরে যাওয়াটা আবার নিশ্চিত। ভেড়ার পাল তার আদরের ডাকে সাড়া দেয়। আবার তারই পায়ে পায়ে মাংসের দোকানে গিয়ে ওঠে।

কোন এক অন্যমনস্ক অথচ অভ্রান্ত রাখাল পৃথিবীর আকাশ বাতাস মানুষজন নিয়ে একা একা হেঁটেই চলেছে। হেঁটেই চলেছে। কারুর দিকে না তাকিয়ে। সব শক্তি তার। অথচ সেজে রয়েছে সামান্য রাখাল। তার আদর আছে। আছে বিদায়।

বিশ্বনাথের খেয়াল হলো, তার বাবা কখন এসে তেতলার এই জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে।

তার দিকে না তাকিয়েই মহেশ্বর নিজে নিজে বললো, ধরিত্রীটা ভেঙে গেল। এবার জো আসবে! ফুর্তিতে হাল চলবে।

তুমি তো ভাতই খাও না বাবা। তা হাল দিয়ে জমিতে এত ধান করে তোমার লাভ?

জানলা থেকে ছেলের দিকে ফিরে তাকালো মহেশ্বর। আমার ব্লাড সুগার—তাই খাইনে। কিন্তু তাই বলে ফলাবো না? এ কি কথা বিশে! মাটি থেকে যতটা পাওয়া যায়—সব উশুল করবো না?

এত ধান দিয়ে কি করবে তুমি?

ফসল তোলায় আনন্দ নেই কোনো? ধান ঘরে রেখে দিতে পারলে আশ্বিন-কার্তিকে টানের সময় ভাল দরে বেচে দেওয়া যায়। দুটো পয়সা আসে তখন।

এত পয়সা দিয়ে কি করবে বাবা?

কত বড় খরচ—খেয়াল আছে! তোমার কাকাদের সংসার খরচা—

সে তো দেবেই বাবা। ওরাও তো আগাগোড়া তোমার পাশে পাশে।

মহেশ্বর মাইতি গম্ভীর মুখে বিশ্বনাথের দিকে তাকালো। আমিও ওদের পুষে আসছি। যখন যা দরকার—তা তো আমি করেই থাকি।

করবেই তো। দাদার কিসে দুটো পয়সা বাঁচে—তা তোমার দু'ভাই দেখে থাকে।

এবার মহেশ্বর মাইতি যে-কথাটি বললো—তা শুনে সে ক্ষ্যাপাতুড়ো খেয়ে গেল। মহেশ্বর বললো, তোমার রাঙাকাকীর দু'চারটে আদুরে মিষ্টি কথায় ভুলে যেও না যেন—তুমি একজন মাসিক। একদিন এসবের তুমিই সর্বেসর্বা হবে

কথা ক'টিতে কী ছিল। ভেতরে ভেতরে বিশ্বনাথ বিষন্ন হয়ে গেল এসব কি বলছে বাবা। রাঙাকাকা—ছোটকাকা উদয়াস্ত খাটে—কেননা-তারা কখনোই ভাবে না যে তারা কর্মচারী। কারবার সবই দাদার—সেই এরকম ভাবলে কেউ কিও রকম খাটে? আর তাদের তুমি মাসকরা তেল ডাল-চাল নামিয়ে দিয়ে খালাস? ফুরিয়ে গেলে ফের দেবে না? নইলে রাঙাকাকীকে কেন ধামায় করে বীজধান সরাতে হয়? রাতের অন্ধকারে?

তুমি কাকে ভালবাস বাবা? কাউকে ভালবাস?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মহেশ্বর বললো, কেন? তোমাকে—তুমি এখন সেয়ানা হয়েছো। মাথা চাড়া দিয়ে লম্বা হয়ে চলেছো। তোমার সব বুঝে না এবারে—যাও—সদর দোরটা দিয়ে এসো।

বিশ্বনাথের ওঠার ইচ্ছে ছিল না।

যাও দোর দিয়ে এসো বলছি—

উঠে গিয়ে দোর দিতে দিতে বিশ্বনাথ বুঝলো, তার পেছনে তেতলার এই ঘরে ঠিক জানলার পাশে মেঝেতে যে থেবড়ে বসে আছে—সে তার বাবা নয়। সে একজন মালিক। মালিকের কথাবার্তায় আদেশের যে গাদ বেরিয়ে পড়ে—এইমাত্র ঠিক তাই ফুটে উঠেছিল মহেশ্বরের কথায়।

এই চাবিটা দিয়ে এবারে ওই গা-আলমারিটা খোলো—

কেন?

আঃ! সব কথায় কথা বলা চাই দেখছি! খোলাই না—

প্রায় ধমক খেয়ে আলমারির কপাট খুলেই বিশ্বনাথ দেখলো, ইস্কুলের এক্সসারসাইজ বইয়ের মতোই থাকে থাকে কারেন্সি নোট। থোক্ ধরে রবারের গার্ডার লাগানো। এত টাকা? বাবা?

হ্যাঁ। তোমার জন্য। তুমি কবে বড় হবে সেজন্যে এতদিন বসে আছি—

কী বলতে যাচ্ছিল বিশ্বনাথ। শামুক পোড়ানো গন্ধটা বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে আরও উৎকট। নিজেকে সেই অস্বস্তির ভেতর সামলে নিয়ে বিশ্বনাথ বললো, এত টাকা দিয়ে আমি কি করবো?

ছাখো বিশ্বনাথ—আমার কোনো টাকা ছিল না—

বেশ তো।

তোমায় ঠেকা দিয়ে কথা বলতে বলিনি। আমি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে নকুলদানা ফেরি করতাম। একটু একটু করে ক্যাপিটাল হলে তবে অয়েল মিলের কথা ভাবি। তোমায় সেসব ভাবতে হবে না। তুমি গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষিত। তুমি হাতে রেডি ক্যাশ পেলে আরও বড় কিছু করতে পারো। আমার মতো ক্যাশের জন্যে তোমার কোনো পেছুটান থাকবে না বাবা।

বিশ্বনাথ ছোট করে বললো, ওঃ!

চাই কি ধানকল দিতে পারো। চাও তো লোহার কারখানা বসাতে পারো। আমার তো বয়স হলো। আমার বাবা আমার জন্যে কিছুই রেখে যাননি—

তবে আমার জন্যে তুমি রেখেছো কেন?—বলেই বিশ্বনাথ দেখলো, জানলায় আবার বর্ষাকালের সেই বেহায়া বৃষ্টি। আসে যায়। কিন্তু থামে না একদম।

কেন? আমি নিজি যে সব অপমান-অশ্রদ্ধার ভেতর দিয়ে গেছি—বাপ

হয়ে তোমায় তা যেতি বলি কি করে! বুঝলে বাবা—সরকারী কলের জল আর তিন পয়সার মুড়ি—এই খেয়ে শুয়ে থাকতাম রেলের প্ল্যাটফর্মে। সকালের আলো ফুটলি দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতাম। সে-সব কথা থাক—

ওসব কথাই আমার বেশি ভাল লাগে বাবা।

তবে শোন—কী করে বড়লোক হলাম। হবো বলে হইনি বাপ—হয়ে গেলাম ফুসমন্তরে! তুমি তো এই দুনিয়ায় ঘোরাঘুরি করে থাকো। দেখবে—কত্ত লোক বড়লোক হবার জন্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তার ভেতরে ক'জন হয়?

কাদার ঝুপড়ির সামনের মাঠটা মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দূরে দিগন্তকে টাচ করেছে। বেলা বেড়ে ওঠায় পাকলেডাঙার রাস্তা লোক কম। দু'-একজনের হাতে কচুশাকের আঁটি। হাতের ঝোলায় নিশ্চয় ইলিশ মাছের মাথা। সেই মাথা দিয়ে কচুর শাক ভাত ভেঙে মাখবার স্বপ্ন সবার চোখে। এই ওপর থেকেও তা দেখতে পাচ্ছিল বিশ্বনাথ।

তখন মহেশ্বর মাইতি বললো, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হবার মুখে মোতিহারি থেকে কয়েক বস্তা তামাক এল। চালান খালাস করে একটা বস্তা ঘাঁটতেই দেখি গোছা গোছা নোট। পরে বুঝেছি—মোতিহারির সেই ইসমাইলি কারবারি দাঙ্গার ভেতর নিজেদের টাকাকড়ি তামাকের বস্তায় গুঁজে রেখেছিল। শেষে মারামারি কাটাকাটির ভেতর বস্তা গুলিয়ে ফেলে।

অত টাকা কোনোদিন চোখে দেখিনি বাপ। টাকাগুলো নিয়ে বছর দুই চুপ করে বসেছিলাম। যদি দাবিদার টাকার খোঁজে খোঁজে আসে। কোত্থেকে আসবে! পরে শুনলাম—দাঙ্গায় সবাই মারা যায়। ভাবো—তাদের কত শখ-আহ্লাদের এই টাকা!

এখন কারবারের ধাঁচই বদলে যাচ্ছে বিশে। এক কেজি তেল বেচে যা লাভ করবি—তার ডবল লাভ একটা ছত্রিশ সাইজের ব্লাউজ বেচলি। তোমার দরকার একখানা মডার্ন বউ। তুমি হাসি হাসি মুখে গদিতে বসবে। বওমা বসবে কাউন্টারে। আশপাশের গাঁয়ের মেয়ে-বউ দোকানে এলি বওমা তাদের বসতি বলবে—তারপর রকমারি ব্লাউজ মেলে ধরবে। সেই সঙ্গে থাকবে শাড়ি, সায়া, সালোয়ার, কামিজ। পয়সা রাখবার জায়গা পাবে না বাপ!

বিশ্বনাথ থ হয়ে তার নিজের বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

তারিখটা ছিল অঘ্রাণের সাতুই। সকাল সওয়া আটটা হবে।

পৃথিবীর চার জায়গায় চার রকমের কাণ্ডকারখানা ঘটেছিল। আমরা একই সঙ্গে সব জায়গায় থাকি না বলে সবই একসঙ্গে দেখতে পাই না। তাই পরের ঘটনার কার্যকারণের সুতোগুলো দেখতে পাই না। ফলে কোনো কিছু পরিণামে ঘটে উঠলে আমরা ভেবেই নিই—ঈশ্বর বলে কেউ আছেন—আর না জানি তিনি কত শক্তিশালী।

শীতের মিঠে রোদ খেয়ে পাকলেডাঙার সদর পিচরাস্তা তেতে ওঠায় বিশ্বনাথের রাঙাকাকী তিন বস্তা এজমালি ধান সেই রাস্তায় ঢেলে দিল। সারা বছরের পুজো-পার্বণের আতপ চালটা সে এইভাবেই তৈরি করে। কে যাবে সেদ্ধ শুকনোর ঝামেলায়। পিচরাস্তায় পড়ে ধানটা খটখটে হয়ে উঠলে ভাঙাতে পাঠিয়ে দেবে।

তেতলার জানলায় বসে বিশ্বনাথ রেজারেকশানে ডুবে যাচ্ছিল। আঠারো উনিশ বছরের মাশলোভাকে খামারবাড়িতে অনেক কাজ করতে হয়। উঠোনে গমের খড়। বারান্দায় বিশ বাইশ বছরের তরতাজা সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট ক্রুশ্চোদোভ্ সর্বসময় তক্কে তক্কে থাকে—কখন একটু মাশলোভাকে দেখা যায়।

তেতলার জানলা দিয়ে নিচে চোখ পড়লো বিশ্বনাথের। রাঙাকাকী বস্তা উল্টে ধান ঢালছে রাস্তায়। আর আমি যে ঘরে শুয়ে শুয়ে টলস্টয় পড়ছি—তার গা-আলমারিতে থাক থাক কারেন্সি নোট সাজানো। এখানকার আকাশে প্রাগৈতিহাসিক ছবির মতোই বর্ষার মেঘ করে এলেও দুনিয়াটা চলে পয়সাকড়ির হিসেবে একদম কড়ায় গণ্ডায়। মালিক, ক্ষমতা, টাকা—এসবের জন্যে আলাদা আলাদা করে জায়গা রাখা আছে।

বারোর দুই সরোজিনীতে ঠিক এই সময়েই রানী দত্তের দিদি এক প্লেট পুলিপিঠে এগিয়ে দিলেন তাঁর স্বামীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তুমি কী ভাবো বল তো? পৃথিবী সেই বুলবুলচণ্ডীর দিনগুলোয় দাঁড়িয়ে আছে।

রানীর দিদি কিছু বুঝতে না পেরে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। বুলবুলচণ্ডীতে থাকতে প্রফুল্ল ঘোষ শ্যামসুন্দর বাজার থেকে সস্তায় দুটি সংকর গরু কেনেন। তোয়াজে রাখায় সেই দুই গাই বাচ্চা হবার পর দুধও দিত বটে। সেই থেকে রানীর দিদির নেশা—দুধের খাবার বানানো। দুধের মিষ্টি ঘরে করা তাঁর স্বভাব।

কিন্তু তাই বলে আজও বানিয়ে যাবে। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না প্রফুল্ল ঘোষ। ওর তো জানা উচিত—সেসব দিন আর নেই। রিটায়ারের পর যা ও বা চাকরি হলো—ঢুকতে দেয় না। মাইনে পাই না। ছেলে ডাক্তার হয়েই আলাদা। এখনো তুমি কোন আহ্লাদে দুধের খাবার করে যাচ্ছো?

বেলেতোড় বাজারে ডক্টর বিশ্বনাথ ঘোষের চেম্বারে এই সকাল সওয়া আটটাতেই থইথই দশা। রোগীর ভিড় উথলে পাশের সাইকেল সারাই দোকানে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে। বাড়িটা একসটেনশন করায় এখন দোতলা। দোতলাতেও একতলার মতোই তিনখানা ঘর। বড় ঘরে ছবির মতো দুটি মেয়েকে লোকাল গার্লস স্কুলের টিচার প্রাইভেটে ক খ গ ঘ লেখা শেখাচ্ছিল।

ডাক্তারের গিন্নি রেখা বেডরুমে এসে ধবধবে সাদা বিছানায় বসে আয়নায় তাকালো। একজন সম্পন্ন গৃহিণীর ছবি সেখানে ভাসছে। এত যে পরিশ্রম গেছে জীবনে—তার কোনো দাগ নেই রেখার মুখে। ঘিয়ে রংয়ের ফুলহাতার ব্লাউজের ওপর দিয়ে জরিপাড় টাঙ্গাইল সিল্কের আঁচল বুকের ওপর দিয়ে কাঁধে গিয়ে পড়েছে। আয়নার রেখার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো রেখা।

এ বড় সুখের হাসি। এ বড় শ্লেষের হাসি।

এখন বিশ্বনাথের বেদম পসার। বাড়িটা নিজেদের। মেঝে খুঁড়ে কলকাতা থেকে আনানো পছন্দের টাইলস বসানো হয়েছে। একতলায় রোগী দেখার চেম্বারের পাশেই এক্সরে-র যন্ত্রপাতি বসছে। আর কি চাই!

রেখা ঘোষ দোতলার জানলা দিয়ে দেখতে পেল—উঠোনের আমলকি গাছটার পাতাগুলো শীতের চাপা বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে। তখনই সে বাঁ হাতের মুঠো খুলে বাড়িগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই সব ক'টা মুখে দিল। দিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে সব ক'টা ভ্যালিয়াম টেন পেটের ভেতরে পাঠিয়ে দিল।

যে কোনো ইনসোমনিয়ার রুগীর অন্তত দশ দিনের ডোজ সে এইমাত্র একবারে খেয়েছে। এবার সে বেশ তৃপ্তিভরে আবার আয়নায় তাকিয়ে হাসলো। এ বড় সুখের হাসি। যেতে হয় তো এমন অবস্থাতেই যাওয়া ভাল। কারও কোনো ক্ষোভ নেই। সবই সুন্দর চলছে। মেয়েরা বড় হয়ে আমার ফটোতে তাকাবে।

সরোজিনীতে এ খবর পৌঁছতে দেরি হলো না। দুর্গাপুরে নেমে মিনিবাস ধরে বাস পালটে পালটে বেলেতোড়ে যখন পৌঁছালেন প্রফুল্ল ঘোষ—তখন সন্ধ্যের খেপে রোগী দেখতে বসে গেছে ডক্টর বিশ্বনাথ ঘোষ। ঘরে ঘরে আলো

জ্বলছে। কেউ না বলে দিলে বোঝারও উপায় নেই এ বাড়িরই গিন্নি মাত্র চার দিন আগে আত্মঘাতী হয়েছে।

রোগীদের পাট চুকিয়ে ভেতরে এসে বিশ্বনাথ দেখলো, তার বাবা মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খেলছে।

ছেলেকে দেখে প্রফুল্ল ঘোষ বললেন, দিদিভাই দুটো একদম ডল পুতুল।

কতক্ষণ এসেছো?

তা ঘণ্টাখানেক—

রাতে ভাত না রুটি খাও আজকাল?

কোনোটাই খাই না। আজকাল একাহারী হয়েছি। তাতে দেখছি শরীরটা ভাল থাকে। আমি বরং ডল পুতুল দুটোকে কাল সকালে নিয়ে যাই। ওদের ঠাকুমা তাহলে আনন্দে ভাসবে। তোর তো গুটিয়ে আসতে আসতে সময় নেবে?

এতক্ষণ মাথা নিচু করে কথা বলতে বলতে শেষদিকে ছেলের মুখে তাকিয়ে একদম নিভে এলেন প্রফুল্ল ঘোষ।

তুমি কি বললে বুঝলাম না বাবা—

বলছিলাম—দিদিভাইদের কাল সকালে নিয়ে যাই—আর তুমি না হয়—

সে হয় না বাবা।

কি হয় না? ওদের মা নেই। কার কাছে থাকবে? তুমি সারাদিন রোগী নিয়ে থাকো।

ওর ভেতরেই সময় করে নিয়ে দেখছি তো।

তা হয় নাকি বিশ্বনাথ!

খুব হয়। আমিই ওদের বাবা। আমিই ওদের মা।

জোর করে তা হয়! বুড়ো বয়সে ওদের নিয়ে আমরা আনন্দেই থাকবো।

তা হয় না বাবা।

কেন হয় না?

এখানকার প্র্যাক্‌টিশ ফেলে আমি যাবো না। আর—

আর কি?

রেখা বেঁচে থাকতে তো ওদের নিতে আসোনি বাবা?

আমি সময়টা পেলাম কোথায়? এক স্কুলে কাজ পেলাম। তা সেখানে ঢুকতে দেয় না।

ওসব ছেড়ে দিয়ে মাকে নিয়ে এখানে এসে পাকাপাকি থাকো দু'জনে।

তা হয় না বিশ্বনাথ। কতকগুলো অপগণ্ডের আবদারে আমি স্কুলের চাকরি থেকে পিছিয়ে আসতে পারবো না। ওখানে আমি ঢুকবোই। হাই-কোর্ট করছি। দরকারে সুপ্রীম কোর্ট করবো।

মফঃস্বল শহরের ইলেকট্রিক আলোয় ভোল্টেজ এক একসময় দারুণ কমে যায়। বিশ্বনাথ তার বাবার নামানো মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। অবিশ্যি প্রফুল্ল ঘোষ এখন চোখ তুলে তাকালে সে-চোখে চোখ রাখার সাধ্য ছিল না বিশ্বনাথের।

একাহারী প্রফুল্ল ঘোষ রাতে কিছু খেল না। বিশ্বনাথ দেখলো, তারও খিদে মরে গেছে। অতএব সেও কিছু খেলো না। শোবার খাটের পাশের দেওয়ালে সদ্য টানানো রেখার ছবি। প্রফুল্ল ঘোষ ওদের জোড়া খাটের বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিশ্বনাথ নিজের হাতে মশারি টানিয়ে চার দিক ভাল করে গুঁজে দিল।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো বিশ্বনাথের। ক'দিন আগেও এই সময়টায় উঠে রেখাকে নিয়ে সে অ্যামবাসাডরে বেরিয়ে পড়তো। রেখা গাড়ি চালানো শিখছিল। কী যে হলো? কেন যে চলে গেল? এইসব ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ল—একতলায় নামার সিঁড়ির দরজা খোলা।

শীতের ভোরে বেলেতোড়ের নীল হিম আকাশের একটা জায়গায় শুধু মেঘ। তাও যেন মেঘকে কেউ আছাড় মেরে সেখানে থেঁতলে শুইয়ে রেখেছে। বাকি আকাশ জুড়ে হিম আর নীল। নিচের পৃথিবীতে বেলেতোড় তখনো ভাল করে জাগেনি। দরজার খিল খুললো কে?

ধক্ করে উঠলো বিশ্বনাথের বুকটা। বাবা?—ডেকেই শোবার ঘরে ঢুকে দেখলো, কখন উঠে চলে গেছেন। খাটের নিচে জুতো নেই। তাহলে ফার্স্ট বাসটা ধরেছেন বাবা। দেখলো—তাড়াতাড়িতে তার বাবা মাথার উলের টুপিটা ফেলে গেছেন। উঃ! কী ঠাণ্ডাটাই লাগবে বাবার। ফাস্ট বাস এতক্ষণে বুদবুদের মোড় পার হলো। দুর্গাপুরে নেমে রেখাকে নিয়ে এই ফার্স্ট বাসেই সে প্রথম বেলেতোড় আসে।

এক সকালে রেখা গেল। আজ সকালে বাবা। জানলায় শীতের আকাশ। সেখানে যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির আস্তানা—যে কি না এই সব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে—নিতান্তই অন্যমনস্ক ভাবে।

ডল পুতুল দুটো এখনো ঘুমের ভেতর সাঁতরাচ্ছে। মুখ ধোবার জন্যে টেবিলে পেস্ট নিতে গিয়ে বিশ্বনাথ দেখলো, শেষ রাতে উঠে চলে যাবার আগে

তার বাবা দু'লাইন লিখে রেখে গেছে।

স্নেহের বাবা বিশ্বনাথ,

আমার পথ হইতে তোমার পথ ভিন্ন। প্রার্থনা করি তোমার পথে তুমি জয়ী হইবে। আং—

বাবা

শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ

বিশ্বনাথের মনে পড়ল, বাবা অনেকদিন হলো নামের মাঝে আর কান্তি লেখেন না।

কাদার পাকাপোক্ত ঝুপড়ির সামনে ঘুরে ঘুরে মাঠের ওপর একই জায়গায় প্ল্যাটফর্মের মাদার গাছটার ছায়া পড়ে লম্বা করে। জষ্ঠি আষাঢ়ের ভেপো গরম। সামনেই বোরোধান কাটার পর ন্যাড়া মাঠ। তার খানা-খোঁদলে বিরোহী ধানের ফল বেরোনো বীজ দু'চারটি ছড়িয়ে দিয়েছিল কাদা। পাতলা করে রাঁধা মুসুরির ডালে বিরোহী ধানের লালচে চালের ভাত মেখে খেতে বড় মিষ্টি। বৈশাখে একটা বৃষ্টি পেয়ে ধানের চারাগুলো মাথা দিয়ে উঠেছে। আমনের হাল পড়ার আগেই বিরোহীর দানা পুষ্ট হয়ে হলুদ হয়ে যায়।

বেলা তিনটে চারটের বিকেল। রায়নার সাটেল ট্রেন চলে গেল। ওখান থেকে বাঁকুড়ার ট্রেন ধরিয়ে দেবে প্যাসেঞ্জারদের। নয়তো বাসও আছে। এক একখানা গাড়ি রেলপাটির ওপর গড়ায়। তাদের গড়ানে শব্দ শুনে এক একখানা কথা মনে আসে কাদার। ইদানীং সেই পুরুষলোকটার কথা খুব মনে ভাসে। মুখচোখ মনে নেই আর লোকটার। একসময় তার বিয়ে-বসা স্বামী ছিল মানুষটা।

এখন কাদা ঢিবির ওপর বসে। মাথার বেশিটাই সাদা। ছাগলের পাট তুলে দিতে বলায় কথার কাটাকাটি করেনি মহেশ্বরের সঙ্গে। কিন্তু কি নিয়ে থাকে সে? কিছুর অভাব রাখেনি মহেশ্বর। কিন্তু নাড়াচাড়া করতেও তো হাতের কাছে কিছু চাই।

ক'দিন খুব পতাকা-টতাকা পুতলো ছেলে-ছোকরারা। গলা চিরে কী সব বলে চেঁচালো। তারপরই ভোঁ-ভোঁ। চড়া রোদ। জল নেই। মাঠে দাঁড়িয়ে রোদ্দুর ভাগ করে তো খাওয়া যায় না!

এই? কে ওখানে—

কাদা ছায়া চেনে। কোনটা মেয়েলোকের কোনটা পুরুষ-মানুষের। বিয়োহী চায়ার ঘন সবুজের ওপর মাদার গাছের ছায়ার পাশেই ছায়াট দাঁড়িয়ে—

এই ভাখো। কথা কয় না—

আমি কাদা—

ও।—বলে উঠে দাঁড়ালো। পড়ন্ত রোদ হলেও মাথায় গিয়ে লাগে। গুটি গুটি নিজের ঝুপড়ির সামনে সাদা করে চাঁছা-ল্যাপা জায়গায় গিয়ে থেবড়ে বসলো কাদা। আপনি একজন ভদ্দরলোক। তায় বামুন মানুষ। অমন সময়ে অসময়ে আসেন কেন? শেষে কথা হবে—নেলাম্বরবাবু—

না না কাদা—কথা হবার মতো বয়স তোমারও আর নেই—আমারও নেই—

মানুষির জিভ হলো গিয়ে সাপ। আপনি ঠেকাবেন কি দিয়ে?

ওসব কথা থাক। কম তো হাঁটাহাঁটি করছি না তোমার দোরে। তুমি বলে দিলে মহেশ্বর রুখে যাবে—

কথাটা পেড়েছিলাম। শুনেই তো তেলে বেগুন। বলে কি—জীবনস্বত্ব বলে কি বাগান আগলে চিরটা কাল বেঁচে থাকতে হবে? বড় বড় অসুখ করে ঠিক সেরে ওঠে।

আমাদের দোষ কথায় কাদা? যদি বেঁচে যাই তো মরতে পারি? বলো কাদা—

সে তো ঠিক। কিন্তু কি জানেন—মানুষটা নিজে তো নানান রোগে কষ্ট পাচ্ছে। কোনোটা সারছে না। চাঙ্গিকে টাকা-পয়সা ছড়ানো। গুটিয়ে তোলার মতো তৈরী হয়নি এখনো ছেলেটা। এরি মধ্যে রক্তে নাকি চিনি বাধায়ে বসিছেন। সে যে কী রোগ—কোনদিন শুনিশুনি—

কথা বলতে বলতে কাদা দেখলো বিয়োহী চায়ার ঘন সবুজে মহেশ্বরের বালক বয়সের বন্ধু নীলাম্বরের ছায়াটা যেন বড় বেশি ঘন। তা হবারই কথা। কাদা তার এই এতখানি বয়সে দেখে আসছে মেয়েলোকের চেয়ে পুরুষলোকের ছায়া বেশি ঘন। আসলে পুরুষের রক্ত বেশি ঘন হয় কিনা।

আমার গিন্নিরও শরীর ভাল না কাদা। এখন আবার যদি মহেশ্বর মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেয় তো গেছি। হাতে নেই একটা পয়সা। ডাক্তার ওষুধ লিখে দিলে কিনতে পারি না—

মেয়েমানুষের বেশিদিন বাঁচা ভাল নয়।

এ এট্টা কথা হলো কাদা ? ও গেলে এই বয়সে আমি যে জলে—

সে আপনি যেখানেই পড়েন—মেয়েমানুষ বেশিদিন বাঁচলি নানান অসুবিধে দেখা দেয়। এই ছাখেন না আমার দশা—

তুমি তো দিব্যি ভাল আছ কাদা।

হ্যাঁ। থাকি খোলা মাঠের সামনে খোলা হাওয়ায়।

তোমার তো অন্নচিন্তা নেই কাদা।

তা নেই নেলাম্বরবাবু। আপনার বন্ধুর সঙ্গে সম্বন্ধটাও তো কম দিনের নয়।

অন্য কেউ হলে এত দিনে পাকাবাড়ি বানিয়ে নিত কাদা।

আমি নিজিই সে পথে বাদ সাধিছি নেলাম্বরবাবু।

কেন ?

আমার কে আছে যে ঘরবাড়ি বানাবো ? একটা তো জীবন! তাও ফুরোয় না।

এদিনই সন্ধ্যে সন্ধ্যে নীলাম্বরের গোহালে গাই তিনটের ওপর ভর হলো। তার গিন্নি বিকেল থেকে বিছানায় পড়ে চিঁচিঁ করছে। তার মানে ফের জ্বর আসবে। নীলাম্বর এক কলসী জল নিয়ে পুকুর থেকে উঠে আসছিল। সবে পেয়ারা পাতার ছায়া জ্যোৎস্নায় পড়ে নাচতে শুরু করেছে বাতাসের সঙ্গে। বাবার আমলের ভাঙা বাংলো বাড়ির ঘরে আজ সন্ধ্যে দেওয়া হয়নি। ঠিক সেই সময় গোহাল থেকে কালো গাইটা তাকে নাম ধরে ডাকলো। নীলু—ও নীলু—

অন্য লোক হলে শুনতে পেত—গরুটা ডাকছে—হাম্বা—হাম-বা-

নীলাম্বর তার বাবার গলায় নিজের ডাকনামটা শুনতে পেল। নীলু—ও নীলু—

যাই বাবা!—বলে সে দৌড়ে যেতে গিয়ে হোঁচট খেল বেলি ফুলের শক্ত বেঁটে ঝাড়ে। উল্টে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কাঁধের জলের কলসীটি পড়ে গিয়ে দু'ফাঁক। তবু ভাগ্যি—হাঁটুটা যায়নি। কোনো রকমে লেংচে লেংচে নীলাম্বর গিয়ে কালো গাইটার সামনে উবু হয়ে বসলো।

ব্যথা পেলি ?

না বাবা। আজ পিসিমা—রাঙাকাকা আসবে না ?

নারে বাবা। বউমা এখন কেমন ?

এই যায় যায়—আবার ফিরে আসে। এই তো অবস্থা—

সন্ধ্যের ফাঁকে তেলকল থেকে ছাড়া পেয়ে বিশ্বনাথ এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে নীলুকাকার বাগানে এসে হাজির। তার চোখে এই বাগানের সঙ্গে পারুলেডাঙার কোনো মিল নেই। সারাটা শ্যামসুন্দর একরকম। আর এই বাগান আরেক রকম।

সারাটা বাগান জুড়ে জ্যোৎস্নায় গাছপালার ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। নীলু-খুড়ির খোঁজ নেওয়া হয় না অনেকদিন। বাগানের তিন পাল্লা আগড় খুলে গোহাল ঘর পেরোবার সময় থমকে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। আধো অন্ধকারে কালো গাইটা ডেকেই চলেছে—আর তার সামনে বসে নীলুকাকা বিড়বিড় করছে।

ওখানে কি করছেন? উঠে আসুন—

নীলাম্বর তখন তার গরুকে বলছিল, চৌষট্টি বছর বয়স অব্দি আমার শুক্রের দশা—

কালো গাই বলল, হাম্বা—আ—

কোথায়! ভাল কিছুই তো ফললো না—?

গাইটা আবারও ডাক নিল। নীলাম্বর শুনলো, ফলবে—ফলবে—।

বিশ্বনাথ আর পারলো না। সে সোজা গিয়ে নীলুকাকাকে ধরে বললো, উঠে আসুন। ও কি হচ্ছে ওখানে বসে বসে?

নীলাম্বর তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। যা বোঝো না তাতে নাক গলানো চাই!

কি হচ্ছে এখানে?

দেখতে পাচ্ছো না? বাবা এসে ভর হয়েছেন। কালো গাইটার মুখ দিয়ে সাক্ষাৎ পিতৃদেব কথা বলছেন—

বিশ্বনাথ মনে করার চেষ্টা করলো। আফিম-টাফিম খায় না তো নীলু-কাকা? রোগাভোগা শরীরে গোয়ালের মুখে বসে চোনায় বসা মাছি-মশারা কামড় খাচ্ছে। বিছানায় পড়লো বলে। খুড়িমা তো আগেই পড়েছে—

আপনারই বাবা কথা বলছেন—বুঝলেন কী করে?

বাঃ! ফ্যামিলি ম্যাটার্সে যা কিছু জানতে চাইছি—গরু অমনি বলে দিচ্ছে।

গরুর ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না?

একদম না। ওর গলায় তো বাবা কথা বলছেন।

আপনার মাথাটি গেছে কাকা! হেরিকেনটা আসুন। গরু কেন ডাকছে আমি বলে দিচ্ছি।

ঘোর অনিচ্ছায় নিভু নিভু হেরিকেনটা নিয়ে এল নীলাম্বর। তেল নেই। পলতে পোড়ার পটপট শব্দ উঠছে। বিশেষ সময় নিল না বিশ্বনাথ। এই দেখুন—পেছনের পায়ের খুরে ইটের টুকরো আটকে আছে। আজ কোথায় ঘাস খাওয়াতে গিয়েছিলেন ?

ইটখোলায় বেঁধে দিয়ে এসেছিলাম।

তবে ?—বলে কালো গাইটার খুরের ভাঁজ থেকে ইটের টুকরোটা বের করলো বিশ্বনাথ।

ইট হয়তো এমনি আটকে গেছে। অন্যদিন তো বাবার সঙ্গে রাঙাকাকা—পিসিমা এসেও ভর করেন।

আপনি বুঝতে পারেন ?

হাঃ! হাঃ! করে হেসে উঠলো নীলাম্বর। দিব্যি বোঝা যায়। গোহাল-ঘরের চারদিক তখন থমথম করে। গাই তিনটের তিনজন ভর হলো বলে ওরাও গম্ভীর হয়ে যায়। কান লৎপৎ করে জানান দেয়—ওরে নীলু। আমরা এসেছি!

একসময় অবস্থা ছিল প্রচণ্ড ভাল। তারপর অভিনেতা বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চাকা উল্টে গেছে—তাও তো অনেকদিন। সারাজীবন ধরে নীলুকাকা বসে আছে—কবে একটা অলৌকিক কাণ্ডে আবার আগেকার সুদিন ফিরে আসে পাকাপাকি।

চলুন। খুড়িমাকে দেখে আসি।

চল। দেখবে আর কি! সেই যে বিছানায় পড়েছে—একদম বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে।

মহেশ্বরের মুখেও এ বাংলোর কথা শুনেছে বিশ্বনাথ। একবার নাকি পূর্ণিমার রাতে এই বাংলোর বারান্দায় সানাই বসান নীলুকাকার বাবা। তখন এখানে রোজই ছুতোর-নাতায় উৎসব লেগে থাকতো। এখন সবটাই প্রায় ভাঙাচোরা—এখানে ওখানে নারকেল ভেগোর পুলটিশ। চট, স্যাতা, কানি।

সাবধানে এসো বাবা। এই সারাই সারাই করেও সারানো হচ্ছে না।

সামান্য আলো—আর সবটাই অন্ধকার। তার ভেতর বিশ্বনাথ কাঠের ধাপ বেয়ে খোলা চাতালে এল।

নীলাম্বর তখন বলছিল—এক বচ্ছরের ধানটা বেচে মিস্ত্রি ধরবো ভাবলাম। তা তাতেও মহেশ্বর বালি ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে—

তার মানে ? বলে দাঁড়িয়ে পড়লো বিশ্বনাথ।

আমার ক্লাসফ্রেণ্ডের তো গুণে নুন দেবার জায়গা নেই!

রসিকতা রাখুন। খুলে বলুন নীলুকাকা—

দু'জনেই প্রায়ান্ধ চাতালে দাঁড়িয়ে পড়ল। এর গায়েই সেই সব কাঠের ঘর—যার কোনোটায় একদিন দুপুরে হয়তো মলিনা এসে তিন ঘণ্টা গল্প করে গেছেন—তা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে—হীরালাল, প্রতিমা দাশগুপ্ত, পৃথ্বীরাজ কাপুর বিকেলের দিকে ওরই কোনো একটা ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছেন নীলাম্বরের বাবার সঙ্গে—হাতে স্ক্রিপ্ট—পাশে ডিরেক্টর—তাও তো পঞ্চাশ বছর আগে।

আমার এই যে তিন বিঘের দাগটা—যা চিরকাল আমি লোক করে হাত-পা ধরে চাষ করাই—তাতে এবার মহেশ্বর ভাগচাষী বসিয়ে দিচ্ছে।

কোনোদিন ভাগচাষী না থাকলেও বসাবেন কি করে?

বসালেই হলো। সাক্ষীসাবুদ সবই রেডি করেছে। শ্যামসুন্দর থানাটাও তোমার বাবার হাতের মুঠোয়। এখনও-জমি আমি কি আর কোনোদিন উদ্ধার করতে পারবো?

কাঁদবেন না কাকাবাবু। পুরুষলোকের কান্না আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

পুরুষলোক? পুরুষলোক দেখলে কোথায়? আমি তো বুড়োলোক। এখন যে কোনোদিন মহেশ্বরের সাজানো-গোছানো ভাগচাষী কোর্টের কাগজ হাতে আমার ওই দাগে নেমে পড়বে—বর্গাচাষের অর্ডার বের করেছে যে—

হেরিকেনের আলোর সঙ্গে আন্দাজে একটা ঘরে ঢুকে পড়লো বিশ্বনাথ। প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শেষে চাদর চাপা যা ফুটে উঠলো বিছানায়—তাকে লাশ বা মড়া বলা চলে।

এ কি করে রেখেছে খুড়িমা?

কে? বিশ্বনাথ? বোসো।

কথার কোনো জবাব দিল না বিশ্বনাথ। বরং নীলাম্বরকে উল্টো ক্রস এগজামিন করতে লাগলো। কি হয়েছিল নীলুকাকা?

ঘাটলার ঝাঁঝি শ্যাওলায় পা হড়কে গিয়ে পড়ে যায়—

আপনি আবার সুন্নি শাক তুলতে গিয়েছিলেন খুড়িমা?

না বাবা। তুমি বারণ করে দেবার পর ওসব আর তুলিনি। মাসে মাসে যে ক'টা টাকা দিয়ে যাও তুমি তাতে আমাদের চলে না। তাই জল তুলছিলাম—মাদা করেছি—পেঁপে চারা বসাবো বলে—তা পা হড়কে—

হাড়-টাড় ভাঙেনি তো ?

একখানা দু'খানা ভেঙেছে নিশ্চয়। নইলে উঠতে পারবো না কেন ?

কাউকে দেখিয়েছেন খুড়িমা ?

আমরা কি কাউকে দেখাই বাবা। পয়সা কোথায় ? ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।

তাই বলে সারা জীবন অচল হয়ে পড়ে থাকবেন ? হেলথ্ সেণ্টারের গুইনবাবুকে ডাকি। শুনেছি তিনি প্রাইভেট কলে ডাকলে হাড় সেট করে থাকেন। শেষে ভাঙা দ হয়ে পড়ে থাকবেন ?

কোনো দরকার নেই বিশ্বনাথ। জীবনটা আর কতই বা বড় !

আবছা অন্ধকার ঘরে নীলু খুড়িমার কথাগুলো কাঠের পুরনো দেওয়াল চারদিক থেকে শুষে নিল। মাথার কাছে একখানা পুরনো ক্যালেণ্ডারে বাল-গোপাল একটি দুধেল গাইয়ের গায়ে অবহেলাভরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। কার ক্যালেণ্ডার—কাদের ক্যালেণ্ডার—এখানে কি করে বা এল—কোনো কিছুই জানার উপায় নেই আর।

নীলাম্বর বললো, আমি কোমর জুড়ে মুখো ঘাসের রস করে লেপে দিয়ে গামছা বেঁধে দিইছি। সব ব্যথা বেদনা টেনে নেবে খ'ন। ও নিয়ে চিন্তা করে মন খারাপ কোরো না বিশ্বনাথ। তুমি তো তবু আমাদের ভাখো।

কয়েক মাস হলো এখানটায় এসে সময়ে অসময়ে বসে বিশ্বনাথ। নীলুখুড়ি নাকি তার মায়ের সঙ্গে একসময় সই পাতিয়েছিল। মায়ের দু'একটা কথা খুড়িমা তাকে বলেছে। সামান্য কথা সব। কিছু কিছু ভুলে গেছেন তিনি। আর মনে পড়ে না। এখন তো খাওয়া-দাওয়াটা ঠিক মতন জোটে না বাবা। তাই সব মনে রাখতে পারি না।

নীলুখুড়িই আবার শুরু করলো। আমাদের জীবনস্বত্ব এ-বাগানে। আমরা চলে গেলে তার হাতে বর্তাবে। তোমার খুড়োমশায় ক'বছর আগে হাত-কোবালা করে দেন। কিন্তু যদি না মরি তো আমাদের দোষ কি বল ? উনি যে এক্ষুণি চান বাগানটা—

বিশ্বনাথ কোনো কথা বলতে পারলো না। সে তো মালিক নয়। অথচ একদিন সে-ই মালিক হবে। কেউ হাড়ভাঙা খেটেও কিছু পায় না। কেউ কিছুই না করে অনেক পায়। কি দরকার ছিল মাদা করে পেঁপে চারা বসানোর ?

শ্যামসুন্দর থানার গা দিয়ে অ্যামবাসাডর হাইওয়ে ধরতেই দু'ধারের সবুজ ধানক্ষেত বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ বলে নেচে উঠলো। ভরা বর্ষায় মাস দুইয়ের ভাটো ধানগাছ জলে নাইছে—বাতাসে নাচছে। যতদূর তাকাও সবুজ। তাতে অদৃশ্য বাতাসের ভেবে বসা ঢেউটা অব্দি বোঝা যায়।

অনেকদিন পর মহেশ্বর নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। তার পাশে বসেছে বিশ্বনাথের রাঙাকাকা আর ছোটকাকা। পেছনের সিটে রাঙাকাকী আর ছোটকাকার মাঝখানে বসেছে বিশ্বনাথ। একটু পরেই তো কুষক সেতু এসে যাবে। তারপরেই সদর বর্ধমানের রাস্তা। বাঁকার মোড়।

ছোটকাকী কোনোদিন কারও সঙ্গে কথা বলে না। আজ হঠাৎ বলে বসলো, সাবধানে চালাবেন বড়দা। স্টেট বাসগুলো কাউকে রাস্তা দেয় না—

ভয় পাবারই কথা। দু'ধারে ধানক্ষেত। মাঝখান দিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া পিচরাস্তা। উল্টোদিক থেকে বৃষ্টিভেজা সব স্টেটবাস সাঁইখিয়া, বোলপুর হয়ে কলকাতা চলে যাচ্ছে। পেছল সরু রাস্তা। স্টিয়ারিং একটু আলগা হলেই—গাড়ি স্কিড্ করবে।

গিয়ার পালটে মহেশ্বর মাইতি বললো, বড়দার ওপর ভরসা রাখো। এই পথে টানা সাত বছর সর্যের লরি চালিয়ে ফিরেছি বউমা।

আবার হু হু করে এক পশলা বৃষ্টি এসে গেল। ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে বৃষ্টির ঝাঁপ দিয়ে ছুটে আসা দেখতে পাওয়া যায়। এই মাঠ যখন ধানকাটার পর খালি থাকে—তখনই হাজিপুরিয়া রাখালরা ভেড়ার পাল নিয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তের দিকে যায়। তাদের মুখ দেখেছে বিশ্বনাথ। যেসব মুখে কোনো রাগ, অভিযোগ, অভিমান, আহ্লাদ বা আনন্দ নেই। সব সময় কিসে তন্ময় তাদের চোখ। পায়ে পায়ে ভেড়ার দল। পথে পশমকলে লোম জমা দিয়ে তবে এই পাড়ি।

সেই কলেজ ছাড়ার পর গত ক'বছরে এদিকে আর আসেনি বিশ্বনাথ। একবার চেঁচিয়ে তার বলার ইচ্ছে হলো—আমি বিশ্বনাথ মাইতি। কিন্তু বলতে পারলো না। একপাশে রাঙাকাকী। আরেক পাশে ছোটকাকী। সামনের সিটে বাবা কাকারা। তবু বিশ্বনাথের ইচ্ছে হচ্ছিল বলে—আমায় চিনতে পারো? এই পথ দিয়ে আমি গরমের ছুটির শেষে হোস্টেলে ফিরতাম।

পৃথিবীতে এক একসময় এক বিশাল প্রান্তরে শুধু একটা তালগাছ কিংবা একটা ছাগলছানা, নয়তো ধানকলের একটা চিমনি একা দাঁড়িয়ে থাকে। এখন বৃষ্টিভেজা দুই দিগন্তের মাঝখানে মাত্র একখানা অ্যামবাসাডর গাড়ি।

আর তার বনেটের দিকে তাকিয়ে সামনের আকাশ থেকে গাঢ় ঘন একখানা কালো মেঘ ঝুলে আছে। কোথাও আর কিছু নেই। নিড়েন দেওয়ার পর খলবলিয়ে ওঠা ধানের মাঠে আজ কেউ কাজেও আসেনি।

চলন্ত গাড়ির কাচ তুলে দেওয়ার পর ভাঙাচোরা রাস্তার ঝাঁকুনিং চোটে ভেতরের ছ'জন মানুষের গায়ে ঘষাঘষি হয়ে যাচ্ছিল। ওরই ভেতর মহেশ্বর স্টিয়ারিংয়ে ঝুঁকে পড়ে পাশের ভাইদের বললো, তোমরা যে আজ না-দাবি লিখে দিচ্ছো—তা স্রেফ একটা আইনের রাস্তা—

কোনো ভাই কোনো কথা বললো না। রাঙাকাকা—ছোটকাকা—দু'জনেরই চোখ সামনের রাস্তায়। পেছনের সিটে বসে বাবার কথাটায় কান কেমন বুজে এল বিশ্বনাথের।

মহেশ্বর বললো, এ-বাড়ি ঘরদোর—তেলকল, টকিহাউস—সবই আগের মতো তোমরাই ভোগদখল করবে। এতদিন সব এজমালি কারবারের মতো চলেছে। এখনো তাই চলবে। শুধু কাগজে কলমে এবার থেকে নামটা থাকবে তোমাদেরই ভাইপো—বিশের—বিশ্বনাথের—

আমি এবার বিশ্রাম নেব। কতদিনই বা আর আছি!

না না বড়দা। আপনি এখনো অনেকদিন থাকবেন।

মানুষের ইচ্ছে একরকম—আর ভগবানের ইচ্ছে আরেকরকম। বুঝলে বউমা—

রাঙাকাকী বললো, এবারে বিশের বউ আসবে। আপনিই দাঁড়িয়ে থেকে আনবেন—

সেরকমই তো ইচ্ছে। ইন্দাস থেকে একটি পাত্রীর খোঁজ এসেছে।

ভাসুর ভাদ্রবউয়ের এসব কথার মাঝখানে বিশ্বনাথের ছোটকাকা হঠাৎ বলে বসলো, আমি না-দাবিতে সই দিতে পারবো না—

মাঝমাঠে গাড়ি থামিয়ে মহেশ্বর মাইতি তার ছোটভাই নাদন মাইতির মুখে তাকালো। কেন? এই ব্যবসাপাতি—ইমারতি স্টোর্স—ধানী জায়গা—এইসব তুই করেছিস?

না।

তবে?

তুমি বুদ্ধি, সলা, পয়সা—সব ঢেলেছো। আমরা চোখ বুজে তোমায় অর্ডারমতো গতর ঢেলেছি। একটা পয়সা এদিক ওদিক করেছি বলতে পারো?

ছিঃ নাদন। তা কেন বলবো?

গতরের বদলে পেটভাতায় রেখেছো আমাদের। কি বলিস মেজদা?

মেজদা মানে বিশ্বনাথের রাঙাকাকা—ফুনু মাইতি একথায় কান দিল না। সে দাঁড়ানো গাড়ির জানলা দিয়ে ভিজে গাছপালা যেমন দেখছিল—দেখতে থাকলো।

নাদন বললো, আমরা তোমার অতি বিশ্বস্ত চাকর হয়ে খেটে আসছি—

ছিঃ ভাই! ওভাবে বলে? আমি তোদের বড়ভাই। পাঁচ হাজার করে পেলি কাল। আর কত দিতে হবে বল?

বৃষ্টির দাপটে গাড়ির সব কাচ ওঠানো! ভেতরে নিঃশ্বাস আটকে আসছে। কিন্তু বাবার এই না-দাবি লেখানো নিয়ে আচমকাই গাড়ির ভেতরে বাতাস ভারি হয়ে এলো বিশ্বনাথের কাছে। হাত এগিয়ে যে কাচটা তুলে দেবে—তাও পারলো না বিশ্বনাথ। কেন না, তা করতে গেলে রাঙাখুড়ির গায়ে কনুই লেগে যাবে। এই মাত্র না-দাবি লেখানো নিয়ে ছোটকাকার কথাবার্তায় সে যে আলাদা শিবিরের লোক হয়ে গেছে। একথা ভাবতেই বিশ্বনাথের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

নাদন মাইতি বললো, আরও দশ দশ হাজার তো খসাও—তবে ভেবে দেখবো সই দেবো কিনা। সই না হলে সবই তো এখন এজমালি বিষয়!

ছাখ নাদন—চাপ দিয়ে যদি টাকা খসাতে যাস তো বুঝবি ভুল রাস্তায় হাঁটছিস।

আমাদের আবার ভুল আর ভাল রাস্তা! তোমার হাতেই বড় হয়েছি। টাকাপয়সা তুমিই দাও। তাই চাইলাম বড়দা—

তাই বল। দশ বিশ পঞ্চাশ হাজার—সবই তো তোদের জন্যে।

উঁহু। একথা বলো না।

আচমকা ফুনু মাইতি এ কথা বলায় মহেশ্বর তার পরের ভাইয়ের মুখে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। তারপর জানতে চাইলো—কি চাস তোরা? আমি চোখ বুজলে আমার একমাত্র ছেলে অনাথ হয়ে দোরে দোরে ঘুরবে?

বিশ্বনাথ আপত্তি করে কী বলতে গেল। অমনি মহেশ্বর ধমকে থামিয়ে দিল। তুই চুপ কর—

তখন ফুনু মাইতি বলছিল. আমাদের তো অনেকদিন হলো আলাদা করে দিয়েছো। যদিও মাসকরা তেল নুন ডাল—সবই তুমি নামিয়ে দিয়ে থাকো—অসুখে-বিসুখে তুমিই দেখে থাকো।

কি চাস তোরা আমার কাছে? আমিই কি সাহস করে তেলকল সাইনি? টকিহাউস লিজে নিইনি?

ফুনু মাইতি বললো, আমার কথা যদি বল—আমি কিছু চাইনে। চোখ যদি তুমি এখন বুজেই বস—তাহলেও বিশে অনাথ হবে না—

দুই বউ একই সঙ্গে বললো, চলেন তো বড়দা খরো খরো। এরপর সদরে পৌঁছালে কোনো কাপড়ের দোকান খোলা পাওয়া যাবে না। আজ না আমাদের শাড়ি দেবেন বলেছেন।

মহেশ্বর মাইতি গিয়ে দাঁড়ালে দোকান খুলে খদ্দেরকে দেখাবে।

রাঙাকাকী হাসতে হাসতে বললো, বৃষ্টি ধরেছে। এবার জোরসে চালান বড়দা।

গাড়ি আবার চললো। ভাইয়ে ভাইয়ে—বৌতে বৌতে রসিকতাও হলো দু'চারটে করে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোবার সময়টার সেই সরল স্বচ্ছ বাতাস আর ফিরে এল না গাড়িতে।

কারজন গেটে বিজয়তোরণের দু'ধার ধরে শাড়ি, কাপড়, ছাতা, বাসনের দোকান। বেলাবেলি টানা বৃষ্টির দরুন অনেক দোকানীই ঝাঁপ বন্ধ করে দুপুরে বাড়ি ফিরতে পারেনি। তারই একটায় ঢুকে মহেশ্বর বেশ দরাজ হাতে দুই বউমায়ের জন্যে দু'খানা মুগা সিল্কের সুতোর কাজ করা ঝকঝকে টাঙ্গাইল কিনে ফেললো। এক একখানারই দাম পাঁচশো টাকার ওপর।

তারপর রায় ব্রাদার্সের পাশে বড় মিষ্টির দোকানটায় সবাইকে বসিয়ে মহেশ্বর বললো, ফুনু, তুই অর্ডার দে। আমি গোপাল মুহুরিকে গিয়ে ধরি। স্ট্যাম্প কিনতে হবে—ডেমি কেনা বাকি—

বলতে বলতে মহেশ্বর জি. টি. রোডের ওপারে ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অফিসের গায়ে রেজিস্ট্রি অফিসে ছুটলো।

বড় বড় ছানার মিষ্টি। দুটো প্যাকেটে দু'খানা দামি শাড়ি। অনেকদিন পরে মহেশ্বর ছোট দু'ভাইয়ের জন্যে একজোড়া ছাতাও কিনেছে। মেঘলা আকাশ দেখে ভরদুপুরেই দোকানী আলো জেলে দিয়েছে। ফলে শো-কেসের মিষ্টিগুলোকে দেখাচ্ছে জ্যান্ত। এর ভেতর বিশ্বনাথ নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে বসে। তার গলা দিয়ে কচুরি নামছে না। বিষম খেয়ে তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল খেল সে। কিছুরই অভাব নেই এখানে। থরে থরে খাবার। মহেশ্বরের হাতব্যাগ ভর্তি টাকা। গাড়ির ট্যাংকে পেট্রোলে ভর্তি। কাকাদের হাতে আনকোরা ছাতা। কাকীমাদের হাতে দামি শাড়ির প্যাকেট। এই-

মাত্র নাদন মাইতি তার বড়ভাইয়ের সঙ্গে কড়ার করেছে—না-দাবির দলিলে সই দিয়েই দু'হাজার টাকা পাবে।

বাকি আট হাজার পারুলেডাঙায় ফিরে গিয়ে দিলেও চলবে। কিন্তু দিতে হবে। আকাশও ঘনিয়ে এসেছে আরও। বিশ্বনাথ স্টুডেন্ট লাইফে একবার সদর বর্ধমানে বেড়াতে এসে জেলা হাসপাতালের মর্গে এরকম চেহারা দেখেছিল এক সন্ধেবেলা। কড়া ইলেকট্রিকের আলোয় থমথমে মর্গ। একটা লোক নেই। মড়াদের সারি সারি পা খোপ থেকে বেরিয়ে। এখানে যেমন এখন কাচের শো-কেস উথলে ল্যাংচা বেরিয়ে আছে কড়া আলোয়।

দলিল লিখে গোপাল মুহুরি সই করাতে এল সবাইকে। হাকিম ডাকলে একবার যাবেন সবাই।

সই হয়ে গেলে মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে গোপাল জানতে চাইলো, ঈশাদি?

মহেশ্বর মাইতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে। গোপালের একথায় ক্ষেপে উঠলো সে। এতকাল দলিল লিখছো—ঈশাদি সাক্ষী তৈরী রাখেনি?

রেখেছি মাইতিমশায়। কিন্তু ওই টাকায় কোনো সাক্ষীই সই দেবে না। বাজারটা দেখছেন তো। সব জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে—

সে তো জানি। সাক্ষীদের ভাঙানো টাকা গুছিয়ে এনেছি। নাও এখন ভালয় ভালয় রেজিস্ট্রি সারো।

সবাইকে গুছিয়ে-গাছিয়ে মহেশ্বর মাইতি রাস্তায় নামলো। ঘন ঘন সাইকেল রিকশা। প্যাচপ্যাচে কাদা। বিজয়তোরণ পেরিয়ে সামনের জি. টি. রোড টপকালেই ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অফিস। তার গায়ে রেজিস্টারের লাল রঙের অফিসঘর। বটতলা। উকিল মুহুরিদের চালাঘর। মিষ্টির দোকান। টেম্পোরারি ভাতের হোটেল। কাটামুণ্ডুর কায়দায় ভাব গড়াচ্ছে।

সই দিয়ে নাদন মাইতি নোটের গোছা ফতুয়ার ভেতর-পকেটে গুঁজে টাকার গরমটা বুকে টের পাবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় গোপাল মুহুরি রেজিস্ট্রি অফিস থেকে শুকনো মুখে বেরিয়ে এল। হাতে স্ট্যাম্প কাগজে লেখা না-দাবিপত্র। মাইতিমশায়! আজ তো হচ্ছে না—

কেন? বলে গুম হয়ে দাঁড়ালো মহেশ্বর।

ডি. এম. বাংলো থেকে ডাক পেয়ে এইমাত্র চলে গেলেন তাড়াহুড়োয়!

তাহলে গোপাল?

কাল আসুন। ফার্স্ট আওয়ারে। আমি বলে রাখবো 'খন সবাইকে।

পাকুলেভাঙা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। অয়েল মিলের সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতেই মহেশ্বর বৃষ্টির নতুন ঝাপটায় ভিজে গেল। সেই অবস্থাতেই তেলকলের সামনে এসে অ্যাটেণ্ডাণ্টকে ডাকলো মহেশ্বর। বেশ চড়া গলায়। কল বন্ধ কেন?

যাতায়াত আগাগোড়া একাই গাড়ি চালিয়েছে মহেশ্বর। অনেকদিন পরে এতটা চালিয়ে তার একটা ধকলে মহেশ্বরের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে মুখে তাকিয়ে ন্যায্য কথাটা বলতে গিয়েও কলঘরের অ্যাটেণ্ডাণ্ট থতমত খেয়ে গেল।

এজ্ঞে—

ধুত্তোর এজ্ঞে! পরিষ্কার করে বল।

অ্যাটেণ্ডাণ্ট আরও ঘাবড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোলো না। ঠিক এই সময় দোতলার রেনওয়াটার পাইপের ধারাজলে হাত-পা ধুয়ে ধুতির খুঁটে ঘাড়-মুখ দলে মুছে নাদন মাইতি সামনে এসে দাঁড়ালো। বড়দা—বাকি টাকাটা?

একদম কিছু মনে পড়লো না মহেশ্বরের। সে বললো, কিসের টাকা?

—বাঃ। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? মিষ্টির দোকানে বসে সই দিলাম। তখন বললে—বাড়ি ফিরেই বাকি আট হাজার—

কথাও শেষ হয়েছে নাদনের—আর অমনি তেলকলের বেণ্টে হেলিয়ে রাখা নাদনের জন্যে কেনা আনকোরা ছাতাটা হাতে তুলে নিল মহেশ্বর। অকৃতজ্ঞ! বেইমান!! শুধু নিজের কোলে ঝোল টানতে শিখেছো? এ বাড়ি—এ কারবার—তামাকের গদি—বাজার—টকিহাউস আমি মুখের রক্ত ফেলে দাঁড় করালাম—আর তোদের খাইয়ে-দাইয়ে তাগড়া করলাম—শুধু এই জন্যি? ছি! ছি!! ঘেন্নায় মরে যাই—

থামতে হলো মহেশ্বরকে। ফতুয়ার বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা না-দাবির দলিলখানা খসে পড়ে গেছে।

নাদন মাইতি সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে তার দাদাকেই দেবে বলে সবে ঝুঁকেছে—অমনি আলুথালু মহেশ্বর সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'হাতে দলিলখানা কুড়িয়ে গোড়াতেই ভালো করে ধুলো ঝাড়লো। গিয়েছিল আর কি!

তার এ কথায় নাদন মাইতি ত অবাক। অবাক একটু আগে ধমক খাওয়া মেশিন অ্যাটেণ্ডাণ্ট। আর বিশ্বনাথও বাবা কাকাদের ঝগড়া করতে

দেখে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু পড়ে যাওয়া না-দাবির দলিল ফিরে পেতে তার বাবা যেভাবে চার হাত-পায়ে মেঝেতে ঝাঁপ দিল—ফিরে পেয়ে যে হাসি তার বাবার মুখে ফুটে উঠলো—তা দেখে বিশ্বনাথ পারলে মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু তা তো হবার উপায় নেই। ঝকঝক করছে ইলেকট্রিক আলো। বৃষ্টি ধরতেই পারুলেডাঙার সদর রাস্তায় একজন দু'জন করে লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—মজা দেখবে।

নাদন মাইতি না-দাবিপত্রখানার দিকে তাকিয়ে বললো, ওখানকার সই তো আমি কালই কোর্টে দাঁড়িয়ে বেমালুম অস্বীকার করতে পারি বড়দা। কে ঠেকায় আমায়!

তা বটে—! বলে হাতের ছাতাখানা লাঠি করে এক পা তেড়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো মহেশ্বর—এই বিশে—কাগজখানা ধর তো—বলেই বিশ্বনাথের দিকে ভাঁজ করা না-দাবির দলিল ছুঁড়ে দিল মহেশ্বর।

ভারি স্ট্যাম্প কাগজের চার ভাঁজ করা কড়কড়ে দলিল। তোপ্পাই ক্যাচ লুফে নিল বিশ্বনাথ। সারাটা দিন ধরে এতটা কষ্টে লেখানো দলিল—সর্ষের গাদ মাখানো মেঝেতে তো পড়তে দেওয়া যায় না।

এবার বন্ধ তেলকলের চাতালে যা আরম্ভ হয়ে গেল—তাতে বিশ্বনাথের বুকের ভেতরটায় ফোঁটা ফোঁটা করে গড়াতে লাগল রক্ত। যেন কোনো সিঁড়ির ধাপ আছে বুকের ভেতরে। সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে নিচে কোনো টিনের কৌটোয় জমা হচ্ছে—শব্দ করে—যেমন শব্দ হয় খালি টিনে জল পড়লে। বিশ্বনাথের সারাটা শরীর ভেতরে ভেতরে ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর করে উঠলো।

মহেশ্বর ছাতাটা হাতের লাঠি করে এগিয়ে যাচ্ছে। আর ছোটকাকা সর্ষের কমপেলারের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইমারতি স্টোর্সের খদ্দেররাও এদিকটায় তাকিয়ে। সামনের রাস্তায় লোকজন দাঁড়িয়ে পড়লো।

কী এক অদ্ভুত শব্দ শুনে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মহেশ্বর। কি ব্যাপার? বিশে?

বিশ্বনাথ তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে। তোমরা থামবে? আমি আর পারছি না বাবা—বলতে বলতে বিশ্বনাথ না-দাবির দলিলখানা দু'হাতে যত জোর ছিল তাই দিয়ে দফায় দফায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলো। ছেঁড়া শেষ হলে টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এবার হয়েছে! সারাদিন ধরে অনেক সহ্য করেছি—

মহেশ্বর মাইতি যেখানে দাঁড়িয়েছিল—সেখানেই থাকলো। একটুও নড়লো না। শুধু বললো, এ তুই কি করলি?

কোনো কথা না বলে বিশ্বনাথ গটগট করে ওপরে উঠে গেল। তেতলায় নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে খিল আটকে দিল।

এদিন রাতে মাইতি নিবাসের কোনো তরফেই রান্না চাপলো না। এক রকম অলিখিত অরন্ধন পালিত হলো সারা বাড়িতে। মেশিন অ্যাণ্ডোটাও বলার সুযোগ পেল না—কেন তেলকল বন্ধ ছিল। সারাটা জেলার মেঘলা আকাশে একখানি ঘষা চাঁদ যেখানে যতটুকু পারে আলো দিচ্ছিল। বিশ্বনাথের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে মহেশ্বর ছাদে উঠলো। ছাদ থেকে কাদার ঝুপড়ি এই আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় না। কিন্তু নীলাম্বরের বাগানখানা আগাগোড়া দেখা যায়।

কী মনে হতে তেতলায় নেমে এসে বিশ্বনাথের ঘরের দরজায় কড়া নাড়লো মহেশ্বর। গলা খুব নরম করে ডাকলো, ও বিশে—রাতে খাবি বাবা—?

না।

দরজাটা খোল বাবা—

না।

একদম কিছু খাবি নে? রাত উপোসে নাড়ি মরে।

বললাম তো খাবো না। আমায় একা থাকতে দাও বাবা।

কিছু না বলে মহেশ্বর বন্ধ দরজার সামনের মেঝেতেই বসে পড়লো। তারপর দরজার একটা ফাটা জায়গা থেকে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো। কিছুই দেখতে পেল না। তেতলার মহলটা আগাগোড়াই মহেশ্বরের। লম্বা টানা ঢাকা বারান্দা পরপর তিনখানা ঘরের গা ধরে শূন্যে ভেসে আছে বলা যায়। সেখানে দাঁড়ালে জ্যোৎস্না রাতেও কাদার ঝুপড়ি ছাড়িয়ে বহুদূর দেখা যায়। উল্টোদিকে দেখা যায়—নীলাম্বরের বাগান, টকিহাউসের ছাদ, শ্যাম-সুন্দর থানার ভলিবলের মাঠ।

এখন নিশুতি রাতে বুনো তেঁতুলের ভিজে ডাল থেকে পাকা গেছো বনবেড়াল পাকলেডাঙার বাজারের ফুটো টিনের ছাদে শব্দ করে খসে পড়লো। সারাদিন চরে বেড়ানো ধর্মের ষাঁড়টা লেভেলক্রসিংয়ের গেটে বেদম শব্দ করে গা ঘষছে। ধর্না দেবার ঢঙে বিশ্বনাথের বন্ধ দরজায় মহেশ্বর মাইতি বসে।

সেই দুপুরবেলায় ফতুয়া গায়ে মেঝেতে বসে। জামা ছাড়েনি। হাত-পা ধোয়নি। একটা গ্লাস জলও খেয়েছে কিনা সন্দেহ। ও বাবা বিশে—দরজাটা খোল।

না।

দরজাটা খোল। আমি আর তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবো না বাবা।

ভেতর থেকে কোনো জবাব এল না এবার। কোনো শব্দ না পেয়ে বাইরে মহেশ্বরের বুকটা কেঁপে উঠলো। সে খুব নরম গলায় বললো, তুমি গ্র্যাজুয়েট বাবা। আমি তোমার মুখ্যুসুখ্যু পিতা। ভুল হয়ে থাকলে এবার ক্ষমা করে দাও। দরজাটা খোলো বাবা। একবার শুধু দেখবো তোমায়—

এবারও ভেতর থেকে কোনো শব্দ এল না।

কী এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রায় কাঁদতে কাঁদতে মহেশ্বর বললো, তোমায় হোস্টেলে দিয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থেকেছি—কবে তুমি পড়াশুনো শেষ করে ফিরবে। সেই ফিরলে, তবে এমন হয়ে ফিরলে কেন?

ফটাস করে দরজা খুলে গেল। তোরঙ্গের গায়ে হেলান দিয়ে মেঝেতে বিশ্বনাথও বসে। তারও দুপুরের ধুতি শার্ট বদলানো হয়নি। ঘরের ভেতর থেকে বিশ্বনাথ জানতে চাইলো, কেমন হয়ে ফিরেছি?

দুরুদুরু বুকে মহেশ্বর বললো, মনে তো অনেক ইচ্ছে ধরে রেখেছিলাম। ইন্দাস থেকে অনেক সোনাদানা নিয়ে বউ আসবে। মডার্ন ছেলের জন্যে মডার্ন বউ। হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েছে। তোমার সঙ্গে কাপড়ের দোকান দিয়ে ব্লাউজ কাউণ্টারে বসতো। পার পিসে চার সওয়া চার টাকা মেরে কেটে থাকতোই—

অন্য কিছু বলবে?

না বাবা। ওসব কথা থাক। তুমিই যখন পাল্টে গেলে—তোমার জন্যি সব এতকাল ধরে আগলে বসে থাকলাম—আর তুমিই শেষে না-দাবিখানা কুটিকুটি করে ছিঁড়লে?

ছিঁড়বো না? রাঙাকাকার ছেলেটা আমার ভাই। সে শুধু টকিহাউসে গিয়ে ছবি দেখে আর বছর বছর ফেল করে।

তার ভাগ্যি সে বানাচ্ছে! আমরা তার কি করবো?

বাঃ! তার বাবা সারাদিন তোমার তামাকের গদিতে বসে গুড়ের মাছি তাড়িয়েও সবকিছুতে না-দাবি লিখে দেবে—আর তার ছেলের জন্যে আমাদের কিছু করার নেই? এ হয় কখনো? রাঙাকাকী সম্বচ্ছরের ধান সেদ্ধ শুকনো

করে স্রেফ খাইখরচের চালটুকু পাবে? আর কিছু নয়? সেদিক থেকে ছোটকাকা তবু নগদ টাকা চাইতে পারে। তার অবস্থাটাই বা কি!

যে যার ভাগ্যি করে আসে বাবা বিশ্বনাথ।

ভাগ্য তো তুমি না-দাবি লিখিয়ে হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলে—তাই না?

খানিকক্ষণ দু দিকই চুপচাপ। মাঝখানে আবছা আলোয় দরজার দুই খোলা কপাট। বাইরে ঢাকা বারান্দার কানাৎ ধরে মেঘমাখানো একখানা ঘষা চাঁদ।

মহেশ্বর জানতে চাইলো, তা এখন তুমি কি করবে?

জানি না। তবে ভোরের বাসে বর্ধমান যাবো। সেখান থেকে লোকাল ধরে কলকাতায়—

কলকাতায় যখন যাচ্ছো—হাউসের ছবি বদলাবার সময় হলো। মতিশীল স্ট্রীটে ডিস্ট্রিবিউটরদের ঘরগুলো ঘুরে এসো একবার—

ওসব আর আমাকে বোলো না বাবা।

বারোর দুই সরোজিনীতে পৌঁছতে পৌঁছতে বিশ্বনাথের বেলা বারোটা বেজে গেল। প্রফুল্ল স্যার তো নেই—বলতেই বিশ্বনাথ জানতে চাইলো, স্কুলে গেলে পাবো?

রানী দত্ত বললো, হ্যাঁ। এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন সেখানে।

তাহলে ঠিকানাটা দিন।

ক'দিন ধরে রেজারেকশন পড়তে পড়তে বিশ্বনাথের মনে হয়েছে—সারাটা উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা—সেসব ঘটনার মুখোমুখি সংঘর্ষ ছাড়াও দুই চিন্তায় বিশ্বাসেরও একটা বেদম সংঘাত ঘটেছে সারা বই জুড়ে। মধ্যবয়সী অনুতপ্ত বিচারপতির চিন্তাভাবনায় দণ্ডিত নিহিলিস্টের কী গভীর তাচ্ছিল্য। হাঁটাপথে সাইবেরিয়া যাত্রায় তার কাছাকাছি হওয়ার জন্যে ঘাগু কয়েদী মাশলোভার কী অসম্ভব আকুলিবিকুলি। আর সেই মাশলোভার কাছ থেকে একটুখানি ক্ষমা পাবার জন্যে—জেলে তার কষ্ট সামান্যও যদি কমানো যায়—সেজন্যে বিচারপতি হয়েও নেক্লোদোভ্ তার সামাজিক পরিচয় বিপন্ন করতে পেছপাও নয়। সব ক'টি চরিত্রই তন্ময়—তদ্গত—যে যার মতো অঞ্জলি দিয়ে চলেছে—নিজের নিজের বিশ্বাসে—ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। মানুষ তলিয়ে যেতে যেতেও জেগে ওঠে ফের। নয়তো সে কি বাবার অত কষ্টে তৈরি না-দাবির দলিল ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে পারতো?

স্কুলে নয়—স্কুলের বারান্দায় প্রফুল্ল ঘোষ বসেছিলেন। মেঝের ওপর।

কাঁধের চাদরখানা খানিকটা বারান্দায়—খানিকটা মাটিতে লুটোচ্ছে। এক পায়ে পাম্পসু নেই।

স্যারেরই খোঁজে বিশ্বনাথ সিঁড়ি ভেঙে অফিস ফিরে যাচ্ছিল। বাঁয়ে তাকাতেই এই দৃশ্য। একি? কি হয়েছে স্যার? উঠুন—

বিশ্বনাথকে ধরে উঠতে উঠতেও তার মুখে তাকাতে পারলে না প্রফুল্ল ঘোষ। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, হাইকোর্ট করেছি—এবার সুপ্রীম কোর্ট করবো আমি—

দাঁড়ান। আপনার আরেক পাটি পাম্পসু তুলে আনি—বলে বারান্দার নিচে ঘাসের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে থাকা পাম্পসুটা তুলে নিয়ে এসে স্যারের পায়ের সামনে রাখলো বিশ্বনাথ। আজ কি ছুটি হয়ে গেছে?

নাঃ নাঃ! স্রেফ বিজয়োৎসব!!

কিসের?

এই যে আমায় জব্দ করার—। আমি হেডমাস্টার—আমার হাইকোর্টে জিত হলেও মাসমাইনেটা আটকাতে পেরেছে—সেই আনন্দে স্কুল ছুটি দিয়ে দিল ঘণ্টা বাজিয়ে। ছুটির আগে একটা বক্তৃতাও হয়েছে। আমায় ম্যান-হ্যাণ্ডেল করে ফেলে দিয়ে বলা হলো: আমি নাকি সমাজের শত্রু! আমি নাকি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে তবে হেডমাস্টারের পোস্টটা উপহার পেয়েছি!! আচ্ছা বল তো বিশ্বনাথ—একজন রিটায়ার্ড পেটি স্কুল টিচারের সঙ্গে ইম্পিরিয়ালিস্টরা এহেন গাঁটছড়া বাঁধে কখনো?

অ্যাবসার্ড স্যার। কে বলছে এসব কথা?

যারা আমায় এ স্কুলে কাজ করতে দেবে না। স্কুল ছুটি দিয়ে দরোয়ানদের হাতে টিচার্স-রুম খোলা রেখে বাবুরা গেট মিটিংয়ের পর হইহই করে বেরিয়ে গেলেন! এখন যদি স্টাফরুম থেকে রেজিস্টারখানা চুরি যায়—তাহলে পে বিল তো আটকে যাবে—

যে স্কুল আপনাকে চায় না—তাদের জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ওরা মরুক বাঁচুক—আপনি এখন বাড়ি চলুন তো।—বলে প্রফুল্ল ঘোষের হাতখানা ভাল করে ধরেই বিশ্বনাথ চমকে উঠলো, একি? আপনার গায়ে তো জ্বর স্যার—

সেকথায় কানও দিলেন না প্রফুল্ল ঘোষ। তিনি আগের কথা ধরে বললেন, স্কুল চায় না মানে? রীতিমত চায়। গার্জিয়ানরা কেউ কেউ গোপনে সরোজিনীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। স্টুডেন্টরা সাফার

করছে। কয়েকজন কচিকাঁচা অভিভাবক, দু'জন ষড়েল টিচার আর লোকাল কিছু দাদা গোছের মানুষ মিলে এই ঘোঁটটি পাকিয়েছে। ওরা নিজেদের একজনকে হেডমাস্টার করতে গিয়ে পারেনি—তাই যত রাগ আমার ওপর—আমিও ছাড়ছি নে বিশ্বনাথ—

বাড়ি চলুন স্যার।

একটা ট্যাকসি প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে ব্যাক করছিল। তাকে ধরলো বিশ্বনাথ। কিছুতেই যেতে চায় না ট্যাকসিওয়ালা। বলে—ফেরত আসতে হবে খালি অবস্থায়—

পাঁচটাকা বেশি কবুল করে তবে দু'জনে ট্যাকসিতে উঠতে পারলো। ভাগ্যিস গাড়িটা ধরেছিল সময়মতো। বড় রাস্তায় পড়তেই হইহই করে বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটায়।

সরোজিনীর কাছে এসে আর ট্যাকসি এগোয় না। খোঁড়া রাস্তার মেঠো কাদায় টায়ার স্লিপ করছে। আকাশ কালো করে মেঘ। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। এদিকে গাড়ির ভেতর প্রফুল্ল স্যার যা করতে শুরু করলেন তা যে ঘটতে পারে—কোনোদিন ভাবেনি বিশ্বনাথ। প্রফুল্ল ঘোষ গাড়ির ভেতর হেলান দিয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন। তাঁর পাশে যে বিশ্বনাথ বসে—সেদিকে খেয়ালও নেই। আর ট্যাকসির কাচের বাইরে সব মুছে দিয়ে বৃষ্টি।

এবার ছেড়ে দিন স্যার। আমার ফিরতে হবে—

ট্যাকসিওয়ালার একথায় হুঁশ হলো বিশ্বনাথের। ভাবছিল—গতকালই ঠিক এ সময়ে বাবা কাকাদের সঙ্গে সে বর্ধমান যাচ্ছিল। রাস্তার দু'ধারে ধানক্ষেত।

একটু ধরতে পারবে ভাই—বলতেই ট্যাকসিওয়ালা এগিয়ে এল। প্রফুল্ল স্যার তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিলেন। দু'জনে ধরাধরি করে প্রফুল্ল ঘোষকে এনে বারোর দুইয়ের বারান্দায় পাতা খাটে বসালো।

বসাতেই প্রফুল্ল ঘোষ শুয়ে পড়লেন চিৎ হয়ে। গলায় সেই গুনগুন। হাত দু'খানা পাখির মতোই বুকের দিকে গোটানো। বিশ্বনাথের চোখে চোখ পড়তেই ওরই ভেতর গান না থামিয়ে ফিক করে একটু হাসলেন।

বিশ্বনাথই লজ্জা পেল। তার আন্দাজ—জ্বরের কাঁপুনির সামাল দিতেই স্যার ওভাবে গুনগুন করে গাইছেন। বিশ্বনাথের গুরু-মা এসে পা থেকে পাম্পসু খুলে নিলেন। তারপর মোটা তোয়ালে দিয়ে পা দু'খানা ভাল করে মুছে দিলেন।

রানী দত্ত এসে বললো, সর দিদি—এখানে থাকলে বৃষ্টির বাতাসে জামাই-বাবুর জ্বর আরও বেড়ে যাবে। যখন বেরোচ্ছিলেন—তখনই তো ওঁর গায়ে জ্বর।

আমায় বলিসনি তো?

বলে কি হতো! ওঁর স্কুলে যাওয়া আটকাতে পারতে? আর তুমি তো তখন রান্নাঘরে! নাও ধরো এখন.

ভেতরের বসবার ঘরেই শোয়াতে হলো প্রফুল্ল ঘোষকে। তারপর শুরু হয়ে গেল মাথায় জলধাপনী। বিশ্বনাথ মাঝে মধ্যে জলের বালতি পালটে দিচ্ছিল।

বিকেলের মুখে জ্বর পড়ে এল। তখন আর বাইরে বৃষ্টি নেই। তার গুরু-মা সেই যে বসেছেন—ঠায় জল দিয়ে চলেছেন স্যারের মাথায়। ঘর অন্ধকার বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি—গুরু-মা কাঁদছিলেন চুপচাপ—জল ঢালতে গিয়ে হাত আটকা বলে চোখ মোছা হয়নি। কলকাতার সরোজিনী কলোনীর এই প্রায়ান্ধ একতলায় বিশ্বনাথের নিজের মায়ের কথা মনে পড়লো। মা জিনিসটি তার কাছে শুধু একখানি ফটো হয়েই থাকলো চিরকাল।

প্রফুল্ল স্যার উঠে বসলেন।

করছেন কি জামাইবাবু? ঘুরে পড়ে যাবেন। এই তো খানিক আগে একশো চারের ওপর জ্বর ছিল।

আমি ভেতরে গিয়ে শুচ্ছি। বিশ্বনাথকে থেকে যেতে বল। আজ এখানে খাবে ও।

না স্যার। আমি ঠিক চলে যেতে পারবো।

ভেতরের ঘরে যেতে যেতে প্রফুল্ল স্যার বললেন, পাগল হয়েছো? বর্ধমানে নেমে শ্যামসুন্দরের লাস্ট বাস পাবে আজ? তাও আবার বর্ষার রাতে—!

স্যার ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। তার মনে পড়ল, স্যারের সঙ্গে রেজারেকশন নিয়ে তার কথা বলার ছিল। কিন্তু এটা তার সময় নয়।

সরোজিনীর ঘরে ঘরে অফিস কাছারি ফেরত মানুষজন এখন। কেউ কেউ চায়ের পেয়ালা হাতে বারান্দায় বসেছে। সামনে মুড়ির বাটি। সন্ধ্যার পুরো অন্ধকার নামার আগে মেঘলা আকাশ-ভাঙা একরকমের পাতলা আলো।

সরোজিনী কলোনীতে নানান জেলার মানুষ। খুলনা, যশোর, বরিশাল,

ফরিদপুর, ঢাকা। এক এক জেলায় এক এক রকমের ঠাকুরবাড়ি। প্রতিমা। ভোগ। ঢোল-কাঁসি। সন্ধ্যে হলেই তা ঐকতানের মতো শুরু হয়ে গেল। সে পরিষ্কার দেখতে পায়—মানুষের ইতিহাস পেশীর জোরে বেলুন হয়ে ফুলে ওঠে। আবার পেশীরই অভাবে চারদিক থেকে সেই ইতিহাস শুকিয়ে আসে। কথাটা বুঝতে বা বোঝাতে—বিশ্বনাথের মনে হলো—ইতিহাসের জায়গায় যদি 'সীমান্ত' কথাটা বসানো যায়—তাহলে কেমন হয়?

মানবজীবনও কী তাই নয়? পেশী বলতে যদি স্বপ্ন, কল্পনা, প্রাণশক্তি ভেবে নিই—তাহলেই তো একই কথার ভেতর মানবজীবনকেও আনা যায়। মানবজীবনই তো আসলে একটি দেশের ইতিহাস ওরফে সীমান্ত।

উঁচুতলার রাশিয়া যখন উইন্টার প্যালেসে মদ, দামী খাবার, গয়নাগাঁটি ঝলমলিয়ে রাশিয়ার জারের চোখে পড়ার চেষ্টা করে চলেছে—ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে কয়েদীর দল রুট মার্চ করে রওনা হয়েছে সাইবেরিয়ার পথে। তাদের পেছন পেছন অনুতপ্ত বিচারপতি। মাশলোভা যে আজ কয়েদী সেজন্যে সে-ই দায়ী। নুক্লোদোভ্‌কে দেখে মাশলোভা থুথু দিল। তাতেও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। স্যারকে এসবের কিছুই বলা হলো না তার।

দিদি। একবার এ ঘরে আয় তো।

যাই।

এখুনি আয়। জামাইবাবু কেমন করছেন—

প্রফুল্ল স্যারের শালীর গলা কোন ঘর থেকে আসছে আন্দাজ করে বিশ্বনাথ সে-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক এই সময় তার গুরু-মা অদ্ভুত গলায় কেঁদে উঠলেন।

বিশ্বনাথ জোরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল।

সাবধান। ভাঙা কাচ পড়ে আছে—

রানী দত্তর এ কথায় থামতে হলো বিশ্বনাথকে, এখানে কাচ এল কোত্থেকে?

জামাইবাবু আর কিছু না পেয়ে ঘরের কোণ থেকে ফিনাইলের বোতলটা তুলে নিয়েছেন। সবটা ফিনাইল চুপচাপ বিছানায় বসে খেয়েছেন—এই ছাখ দিদি, বিছানাতেও ফিনাইল—

বিশ্বনাথ গুরু-মাকে ধরলো। খুব জোরেও না—খুব আস্তেও না গুনগুন করে কাঁদতে লাগলেন গুরু-মা।

তখনই শিশিটা হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে—

পাশের পাশের বাড়িতেই ডাক্তার ছিল। ভদ্রলোক ছুটে এসেই মাস্টার-

মশাই-এর হাতখানা হাতে নিল। তারপর চোখের পাতা টেনে বললো, খানিক আগে মারা গেছেন। আপনারা কিছু টের পাননি?

বিশ্বনাথ বললো, না তো।

রানী দত্ত আর তার দিদি চুপ করে বসে। তারা মাথা নাড়ার দরকারও বোধ করলো না। তখন ডাক্তার বলছিল, ফাইনাল স্ট্রাগেলটাও নিঃশব্দে করেছেন। স্যারেরই কথামতো বিশ্বনাথকে এদিন থেকে যেতে হলো।

পাকুলেডাঙা ফিরতে ফিরতে পরদিন সন্ধ্যে পার হয়ে গেল বিশ্বনাথের।

বর্ষাকালের বাজার। বাজারে আম উঠে গিয়ে কাঁঠালের রাজত্ব। ইমারতি স্টোর্সে এখন শুধু কবজা আর স্ক্রুপ চলে। যা কিনা ঘরের ভেতরে বসে লাগানো যায়। যে জিনিসটার বিক্রি সব সময় সমান তালে চলে তা হলো সর্ষের খোল। গাইগরুর খাবার। মাছেরও খাবার। আবার জমি বলকারী করতেও লাগে।

একদিকে খোল মাপা চলছে বড় কাঁটায়। পাশেই তেলকল পুরোদস্তুর চালু। জোরালো আলোর নিচে সিমেন্টের চাতালটা ঠিক মাঝখানে। তাতে লাইনোলিয়ম। তার ওপর ক্যাশ বাক্সোতে কনুই রেখে মহেশ্বর মাইতি বসে।

বিশ্বনাথকে ঢুকতে দেখে একগাল হেসে মহেশ্বর উঠে বসলো। কাল ফিরলে না বাবা—?

কোনো জবাব না দিয়ে বিশ্বনাথ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। দোতলার মুখে রাঙাকাকীর সঙ্গে দেখা।

কোথায় ছিলি? কলকাতায় গিয়ে কোনোদিন তো রাত কাটাসনি। বড়দা—আমরা সবাই—তোর জন্যে জেগে কাটালাম—

এবারও কোনো জবাব না দিয়ে বিশ্বনাথ তেতলায় উঠে এলো।

খানিক বাদেই মহেশ্বর ওপরে উঠে এল। কোথায় ছিলি বাবা কাল রাতটা? কোন হোটেলে?

হোটেলে কেন থাকবো? প্রফুল্ল স্যারের ওখানে ছিলাম।

তোদের সেই প্রফুল্ল স্যার? ভাল! আমরা তো ভেবে অস্থির। কলকাতায় গেলে—যত রাতই হোক—বাড়ি তুই ফিরে আসিস ঠিক। ভাবলাম কী হলো তাহলে?

কি আবার হবে?

না। ভাবনা হয় তো—তাই। তা স্যার কেমন আছেন ?

তিনি আর নেই।

অ্যাঁ ? কি হয়েছিল ?

কিছুই হয়নি। তাঁর আত্মার অপমান হচ্ছিল। তাই চলে গেলেন—

আত্মার অপমান ?—কিছুই বুঝতে না পেরে মহেশ্বর ছেলের মুখে তাকিয়ে বললো—সেটা কি জিনিস ? চলে গেলেন মানে ?

চলে গেলেন। সুইসাইড্ করেছেন।

মহেশ্বর থতমত খেয়ে চুপ করে থাকলো। তারপর বললো, না-দাবিখানা ছিঁড়ে ফেলে তুই ভালই করেছিস। ওসব লেখাপত্তরের কি দরকার ? এমনিতেই তো তোর সব।

আমায় ওসব আর বলবে না বাবা।

নাঃ ! আর বলবো না। থাকলে তো তোরই সব।

ঘুরে তাকালো বিশ্বনাথ। সব মানে কি ?

এর আবার মানে কি ! এক জীবনে যা করলাম--আরেক জীবন দিয়ে তুই তা ভোগ করবি। সেটাই তো বাপের শাস্তি।

নীলুকাকার বাগান ?

আর ক'দিন বা ! নীলুর বউ এই বর্ষাতেই যাবে। তারপর বড়জোর আর একটা বর্ষা যদি নীলু টেকে। তারপর তো সারাটা বাগান তোর হয়ে যাবে। পুকুরটা পরিষ্কার করে মাছ ফেলিস। আমার স্বয়ম্বর কাওরাকে বলা আছে। ধানী পোনা এনে ফেলে দেবে—। যাক বাবা, এসব কথা এখন থাক। তুমি হাত-পা ধোও। খাও—আমিই বা আর কতদিন ! চোখ বুজে থাকতে পারি না বলেই এত কথা বলতি হয়।

এখন কিছু খাবো না। শ্মশানযাত্রী ছিলাম—

ওঃ ! সিধে শ্মশান থেকে আসছো ? তা বেশ করেছো। তোমায় বড় ভালবাসতেন মাস্টারমশায়। বউমাদের বলি—ওরা তোমায় লোহা আগুন ছোঁয়াবেন'খন। পারলে দুটো নিমপাতা কেটো দাঁতে—

মহেশ্বর মাইতি চলে গেল। খাঁ খাঁ তেতলায় স্যারের দেওয়া দুধ সাদা মলাটের 'রেজারেকশন' বইখানা টেবিলের ওপর জলজল করছে। কাকভোরে ঘুম ভাঙে মহেশ্বরের। মাথার কাছে ট্রানজিস্টার নিয়ে শোয়া অভ্যেস। কাঁটা ঘুরিয়ে কোনো ভাবের গান পেল তো শোনে। নয়তো দাঁতন মুখে নিচে নেমে আসে। উঠোনবাড়িতে কয়েকটা বাছাই বেগুন চারা বসানো আছে।

তাদের কুয়াশা ভেজা পাতায় সেভিনের সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়।

তারপর নিজের একতলায় বাথরুমে মুখ ধুয়ে তেলকলের গদিতে এসে বসে। আজও তাই করলো মহেশ্বর। এই সময়টায় পারুলেডাঙা জাগতে থাকে। আশপাশের পুকুরের মাছ নিয়ে ফার্স্ট বাস রওনা হয়ে গেছে বর্ধমান। এদিক-কার আনাজপাতি নিয়ে পারুলেডাঙা থেকে ফার্স্ট ট্রেনও ছেড়ে চলে গেছে সেহেরাবাজার।

উল্টোদিকে দুর্গা ডাক্তারের চেম্বার খুলতে এখনো অনেক দেরি। লক্ষণ প্রামাণিক কাকে যেন ইট পেতে বসিয়ে তার মাথাটি কামাচ্ছে। কামানো মাথাটার পেছনটা পড়েছে তেলকলের দিকে।

ইলেকট্রিকে চলে তেলকল। মহেশ্বর চারশো কুড়ি ভোল্টের সুইচ-বক্স খুলে কিটক্যাটগুলো দেখলো। না, ফিউজ ঠিক আছে। এবার মেশিন অ্যাটেণ্ডান্টরা এলেই হয়।

সাদা সর্ষের পরিমাণ মতো মিশেল নিয়ে ইউ পি-র দানা সর্ষে খোলে ভরতে হবে। তারপর সুইচ টিপলেই হলো।

হঠাৎ চমকে উঠলো মহেশ্বর। ও কি? অয়েল মিলের সামনের রাস্তার ওপারে ন্যাড়া মাথায় যে এইমাত্র দাঁড়ালো—সে আর কেউ নয়—তারই ছেলে বিশ্বনাথ। খালি গা। পরনে শুধু ধুতি।

এ কি? কি ব্যাপার বিশে?

বিশ্বনাথ কোনো কথা না বলে নির্জন সদর রাস্তাটি বড় বড় পায়ে পার হয়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালো। একদম মহেশ্বরের মুখোমুখি।

আমি তো এখনো মরিনি বিশে। সাতসকালে কি বলে ন্যাড়া হলি? আর এই বেটা লক্ষ্মণ—মাথা পেলেই—

লক্ষ্মণ ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল। আমি কি করবো বলুন। ছোটবাবু জোর করলে আমি তো না বলতে পারিনে—

ওকে বকছো কেন? আমাকে এখন আর তোমার ছেলে মনে না করলেই ভাল—

মহেশ্বরের মাথার ভেতরে বর্ষাকালের একটা বাজ ঢুকে গিয়ে ফাটলেও এতটা হকচকিয়ে যেত না সে। আবার বল। কি বললি—

একমুখ সকালবেলার হাসি তুলে বিশ্বনাথ বললো, আমি আর তোমার ছেলে নই। ভুলে যাও যে একসময় আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মেছিলাম—

কি সব্বোনাশ!—বলতে বলতে মহেশ্বর খদ্দেরদের জন্যে পেতে রাখা বেঞ্চে

বসে পড়ে টাল সামলালো কোনোরকমে। তাহলে তুই কে?

ভোরের বাতাসে শেষরাতের বৃষ্টি ফিরে আসছিল। রাস্তায় বিশেষ লোক নেই। বিশ্বনাথ বললো, আমি একজন মানুষ। সকালবেলায় পৃথিবীটার দিকে ভাল করে তাকাও। একটা নতুন দিনের আলো এইমাত্র ফুটে উঠেছে—

সে না হয় বুঝলাম বিশে। এখন এটা সকালবেলা—তাও আমি জন্মে ইস্তক জানি। কিন্তু তুই কে?

তোমার কেউ নই। এই পৃথিবীর জন্যে আমি একজন মানুষ।

বাঃ। আমি যে এতকাল ধরে তোকে আদরে ভালবাসায় বড়টি করলাম? আমিও তো একজন মানুষ। আমার জন্যে তুই কেউ নয়?

সে তোমার ভালবাসার গর্ব। আদরের গর্ব। তালগাছের মাথায় বাসা বেঁধে পাখিও তার ছানা বড় করে—উড়তে শেখায়। যাগ্‌গিয়ে! এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি চলে যাবো—বলে দেওয়ালের গায়ে পড়ে থাকা ঝোলাটা তুলে নিল কাঁধে।

চলে যাবি? দাঁড়া—বলে মহেশ্বর বিশ্বনাথের একদম গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমিও তো একজন মানুষ বিশে। আমার জন্যে তুই কেউ নয়?

শুধু তোমার একার জন্যে আমি নই!

কোথায় যাবি বাবা? এ দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। আমি হাড়ে হাড়ে চিনি বিশে—যেদিকে দুচোখ যায়—

পয়সা আছে সঙ্গে?

না।

উঠবি কোথায়? খাবি কি? করবি কি?

কিছু জানি না। উপস্থিত জয়চণ্ডীর পাহাড় অব্দি যাবার ইচ্ছে আছে।

সেখানে গিয়ে কি করবি বাবা! ফিরে আয়। এখানে বসে তোর যা মন চায় তাই কর। আমি তোর কোনো সাধে বাদ সাধবো না। তুই শুধু থাক বাবা। একবার ভেবে ছাখ—তুই চলে গেলে আমি কি নিয়ে থাকবো—এই অব্দি কথা বলে মহেশ্বরের গলা বুজে এলো। চোখ ঝাপসা। সামনে থেকে বিশ্বনাথ মুছে গেল।

তোমার তেলকল আছে। টকিহাউস আছে। আমি চলি—

একবারটি দাঁড়া। তোর খুড়িমাদের ডাকি—

কোনো দরকার নেই।

জয়চণ্ডীতে তোর কে আছে বাবা! সেখানে গিয়ে একটা ছাড়া পাহাড়ে

কি করবি ?

পথের ধারে বসে থাকবো। অনেক লোক তো ওই পথ দিয়ে যায়। যদি তাদের কোনো কাজে আসতে পারি। কাউকে তো তেষ্টায় সময় এক গ্লাস খাবার জলও দিতে পারি!—বলতে বলতে বিশ্বনাথ রাস্তায় নামলো।

মহেশ্বর পেছন থেকে তার ছেলের সন্ত কামানো মাথায় সামান্য আলো পড়ে তা নীল হয়ে যেতে দেখলো। খালি পা। খালি গা। ধুতির খুঁটে কোনোরকমে গা ঢাকতে চেষ্টা করছে বিশ্বনাথ। হাঁটতে হাঁটতেই।

দাঁড়া বাবা! একটু বাদেই লরি যাবে স্টোনচিপ আনতে। ওই রাস্তাতেই। শুধু শুধু বর্ষা-বাদলে তিন তিনটে জেলা হাঁটবি কেন ?

বিশ্বনাথ তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। পেছন ফিরে কোনো জবাব আর সে দিল না। এই পথ দিয়ে সে বাবার সঙ্গে গিয়ে হোস্টেলে ভর্তি হয়েছিল। এখন সেই পথ লোকালয় ছেড়ে ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়লো। পথের দু'ধারে পি ডবলু ডি-র পাথরের ফলক। ওপরের দিকে লেখা বর্ধমান। তার নিচে ইলেক দিয়ে লেখা—৩২।

তার মানে বত্রিশ কিলোমিটার। মাইল কুড়ি একুশ। বাস পেলে ভাল। নয়তো হাঁটতে হাঁটতে সদরে পৌঁছতে হলে—বিশ্বনাথ হিসেব করে দেখলো—বেলা পড়ে যাবে নিশ্চয়। এখন তার অনেক হালকা লাগছে। মনের ভেতর কোথাও কোনো চাপ নেই। মাঠভর্তি বৃষ্টিভেজা ঠাসা ধানচারা। এইবার পৃথিবীতে অনেক ফল হবে।

পিচ পেরিয়ে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছিল বিশ্বনাথ। তার ঠিক পাশে এসে অ্যামবাসাডরখানা দাঁড়ালো। বিশ্বনাথ ফিরে তাকালো। হাঁটা থামলো না। স্টিয়ারিংয়ে মহেশ্বর। সে দরজা খুলে নেমে এসে বললো, এই-ভাবে হেঁটে হেঁটে যাবি ?

বিশ্বনাথ দাঁড়ালো। মহেশ্বর দেখলো, তার মুখে কোনো ক্ষোভ, শোক, আহ্লাদ, অভিমান বা অপমান—কিছুই নেই। সকালবেলার মতোই দাগদা-গালিশূন্য।

কেন শুধু শুধু আসছো ? ফিরে যাও—

মহেশ্বর তখনো বুঝতে পারেনি। চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি—

কতটা এগিয়ে দেবে ? এগিয়ে তো শেষ করতে পারবে না!

যদ্দূর পারি। নে ওঠ গাড়িতে।

না। আমি একা যাবো। তুমি ফিরে যাও।

শেষ দরবার

টাঙ্গার পেছনে শহর ঘুরিয়ে আসছিল। বাদামী রংয়ের ঘোড়াটার সামনে পিচরাস্তায় এখন বাস, লরি গাড়িও কম। মাঝে মাঝে সাইকেল ভ্যানে মানুষজন, কুমড়ো নয়তো গরুর জন্যে সর্ষের খোল বোঝাই বস্তার গাদি। দামোদর পেরিয়ে একটা প্রাইভেট বাস জীবনলাল চট্টরাজের উল্টোদিকে শহরমুখো চলে গেল। আশ্বিনের শেষাশেষি রাস্তার দু'ধারের মাঠ ধানগাছে ঠাসাঠাসি—গর্ভথোড় আসায় গম্ভীর, কালচে, ঘন সবুজ।

বাঁকুড়া-দামোদর লাইট রেলওয়ের খেলনা ট্রেনটা চলে যেতেই জীবনলাল ঘোড়ার পিঠে ছিপটি কষালো। অমনি রেলপাটিতে চাকার রবার লাফিয়ে উঠেই গাড়ি ওপাশের রাস্তার ঢাল ধরে ছুটতে লাগলো। রাস্তা লাল—কাঁকুরে। দু'ধারের শাল জঙ্গলে ফুল আসায় একটা টক মিষ্টি গন্ধ। বাতাসে সে গন্ধ নাকে টেনে জীবনলাল একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলো—লেবেল ক্রসিংটা গাছপালার আড়ালে পড়ে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই ঘোড়া তার নিজের অভ্যেসে দুলকি চালে গাড়িটা টানতে টানতে—গলার ঘন্টির বোল তুলে একটা গেট—গেটের আভাস বলাই ভাল—দু'ধারের ইটের মোটা থাম পেরিয়ে যেন কোন স্টেজের পর্দা উঠে যাওয়ায় একদম অন্যরকমের দৃশ্যের সামনে এসে পা ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

কোমরের বেল্টটা টাইট করে নিয়ে জীবনলাল লাফিয়ে মাটিতে নামলো। রাঢ় দেশের বিকেল। দূরে দূরে মানুষজন নিচু হয়ে নিড়েন দিচ্ছে। জমাট বেঁধে যাওয়া ধানক্ষেতের ভেতর কোনজন কে তা এতদূর থেকে বোঝার উপায় নেই কোনো।

জীবনলাল বারান্দায় উঠতে উঠতে ঘাসে ঢাকা সিঁড়ির ধাপে পা ঠুকে সু জুতোর ধুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। সামনেই ঢাকা দালান। তার গায়ে স্কুলবাড়ির মতো পর পর ঘর। তাতে বড় বড় জানলা। বসার ঘরের পরেই ভেতর বাড়ির প্রথম ঘরে পর্দা ঝুলছে।

পর্দার নিচেই দুই স্ট্র্যাপের কালো লেডিজ স্যাণ্ডেল। জীবনলাল থমকে দাঁড়ালো। ঠিক তখনই বার বাড়ির দালানের ঘুলঘুলি থেকে বকবকম তোলা পায়রার একটা পালক দুলে দুলে বারান্দায় খসে পড়লো।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকার মুখে জীবনলাল পালকটা কুড়িয়ে নিল নিচু হয়ে।

ঘরের ভেতর গদি আঁটা আরাম কেদারায় পা এলিয়ে দিয়ে স্যাণ্ডেলের মালিক তখন ঘুমোচ্ছিল। ডানদিকে একটু কাৎ হয়ে। চেয়ারটা তার শরীরের চেয়ে বড় মাপের। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জীবনলালের হাসি এসে গেল মুখে। সে নিজের মনে মনেই বলল, আসলে এটা আমার বাবার বানানো। তিনি সাইজে আমার চেয়েও বড় ছিলেন। মায়া যেন ইজিচেয়ারের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিচু হয়ে নিজের মাথাটা নামিয়ে দিল জীবনলাল। অনেকটাই নামাতে হলো। তারপর ডান কান মায়ার বুকের কাছাকাছি এনে ধুকপুকটুকু শুনতে চাইলো। পারলো না। শিরদাঁড়া থেকে শরীরের ভেতর যে সুতো দিয়ে মানুষ ঘাড়ের ওপর মাথাটা টেনে রাখে—তাতে টান পড়ায় জীবনলাল বাধ্য হয়ে আবার সিধে হলো।

ঝুঁকে থাকতে না পারায় নিজের ওপর রাগ হলো তার। রাগ করেও সে নিজেকে জল করতে চাইলো। কেননা—এ রাগ তো নিজেরই ওপর। লাভ কি! শরীরটা আর আগের মতো নেই। কতো জায়গায় যে সে এখন পরাস্ত। ঠিক মতো নিচু হতে পারে না। কোমরে লাগে। ঘরের কোণে দাঁড় করানো আয়নায় ঘুমন্ত মায়াসুদ্ধ ইজিচেয়ারের পাশে নিজেকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল।

পিছিয়ে যাওয়া চুল খানিকটা কপালে এখন। গালে মাংস হওয়ায় চোখ দু'টো মুখের ওপর আগের মতো আর ভেসে নেই। শার্টের বোতাম উথলে কাঁচাপাকা বুক। ট্রাউজারের ওপর কোমর-দমন বেল্ট। সাদা কালো দাড়ির ভেতর থেকে নিজের উঁকি-দিয়ে-ওঠা মুখখানা খুব চেনা লাগলো জীবনলালের। অমনি সেই মুখ তার দিকে তাকিয়ে আয়নায় হেসে উঠলো।

চেয়ারটা এতই বড় যে মায়া তার কোলে ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটা মোড়া টেনে নিয়ে পা রেখেছে। নয়তো তার পা মেঝে পেতো না। ঝুলে থাকতো শূন্যে। সে অবস্থায় কেউ ঘুমোতে পারে না!

ফাঁকা বাড়ি। বড় বড় ঘর-দালান। পায়রাদের বকবকম। সামনের লম্বা মাঠ জুড়ে ধান—তাতে উবু হয়ে হয়ে মানুষজনের কিষেণদারি। ঘরের দিককার জানলার পেছনেই কদমগাছে ঠাসা পাতা আর ডালের আড়াল। সেদিক থেকে একটা লাল রঙের ফড়িং এসে মায়ার বাঁ হাতের ব্লাউজের ওপর বসে। ব্লাউজের হাতটা গাঢ় সবুজ।

জীবনলাল এবার ঘুমন্ত মায়ার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো। কোনো

ছোট্ট—কিন্তু মজবুত যন্ত্র যেন ঘুমোচ্ছে। এ জন্যেই কি আমি বারবার—যখন তখন—মেয়েমানুষ ভালবাসি? ভাল লাগে? ভাঙা খোঁপার নিচেই এক কানের মাকড়ি চুলের ভেতর থেকে এইমাত্র উঁকি দিল। মাথার ওপর পাখার স্পিড বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেননা জীবনলাল বুঝলো—সে যদি এখন চুমু খেয়ে জাগাতে যায়—তাহলে মায়ার ঠোঁট মিস করার চান্স আছে। ঝুঁকে ঠোঁট রাখতে গিয়ে টাল রাখা যায় না। আর মায়া ঘুমের ভেতর অজান্তেই চাপা গরমে পাশ ফিরতে পারে। নাকের নিচে ঘামের ফোঁটাগুলো জেগে উঠছে। পাতলা, তেজি শরীরটার নিজের গন্ধ দিয়ে ঘুমন্ত মায়া না জেনেই জীবনলালকে টেনে রাখছিল।

এবারও জীবনলালকে তার নিজের ঝুঁকে পড়া মাথাটা তুলে ফিরিয়ে আনতে হলো। উঃ! এই শরীরটা এমন হেরে যাচ্ছে বার বার। কোমর থেকে ওপর দিকটা তার নিচের দিকের চেয়ে অনেক ভারি হয়ে গেছে। ঝুঁকলে নাভির নিচে বেল্টের বাঁধন ঠেসে বসে যায়। তখন যেন দম আটকে যাবার দশা।

ঘিয়ে রঙের জমির শেষে মায়ার শাড়ির ঘন সবুজ পাড় বাঁ পায়ের গোছ ঢাকতে পারেনি। এই সামান্য পা—তাও কত মনোহারী। মায়াকে পাঁজা কোলে তুলে নিলে কেমন হয়?

কিন্তু তা তোলা হলো না জীবনলালের। শার্টের ওপর শক্ত জনের ওয়েস্টকোটের পকেটে গোঁজা খানিক আগে কুড়িয়ে রাখা পায়রার পালকের ডগা তার মাথায় সম্পূর্ণ অন্য এক আইডিয়া উসকে দিল। সে অমনি মায়ার পায়ের কাছে সরে এসে পালকের ডগাটা দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো।

বাইরে তখন বর্ষায় ধরে রাখা জল খাল থেকে টেনে নিয়ে দশ ঘড়ার ইলেকট্রিক পাম্প জীবনলাল চট্টরাজের পৈতৃক জমিজিরেতে সেচ দিচ্ছিলো—সুন্দর করে কাটা—নির্দিষ্ট সব নালা দিয়ে। জায়গায় জায়গায় কোদাল হাতে মানুষ দাঁড়িয়ে। তার কোদাল দিয়ে সেই জলের ধারা টেনে সরল-বহতা করে দিচ্ছিলো। জল পেয়ে ধানচারার গোড়াগুলো সব ভিজে গেল। তখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা পা ঠুকছে।

কে? বলেই আলুথালু মায়া তড়াক করে উঠে বসলো।—এ কি? এ কি করছেন?

নিজের হাতের কাজে মুগ্ধ জীবনলাল কোনো জবাবই দিল না। বরং বাঁ হাতের কনুই দিয়ে মায়ার উরুতে চাপ দিয়ে তাকে শুইয়ে রাখার চেষ্টা করে

ডান হাতে যেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছিলো—তেমনই দিয়ে যেতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে গালের সাদা-কালো চাপ দাড়িতে ঢেউ দিয়ে প্রায় অট্টহাসি হেসে যেতে থাকলো। সেই হাসির ঝাঁকুনি জীবনলালের মাথার চুলের কাঁচাপাকা ঢেউ ভেঙে দিল। তার পিতৃপুরুষরাও দেওয়ালের ছবিতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

এই মানুষটাকে তার পায়ের কাছে জমাট—দামাল হয়ে সুড়সুড়ি দিতে দেখে মায়া অবাক। বিরক্ত। এই জন্য যে—সুড়সুড়িতে ঠিকমত পা রাখতে পারছে না। তাই শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়ানো দরকার এখুনি।

কিন্তু কিছুতেই তা আর করা হলো না মায়ার। নিজের হাসিতে মশগুল জীবনলাল সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর কেঁপে কেঁপে ওঠা অগোছালো মায়াকে দেখে ফের নতুন হাসির দমকে ঢুকে পড়ছিল। তাতে ভারি মুখের ভেতর চোখ জোড়া হারিয়ে গেল জীবনলালের।

এ আপনি কি করছেন?

কোঁচকানো ভ্রু। বিরক্ত, বাঁকা ঠোঁট। জীবনলাল হাসি গিলে ফেলে তাকালো। কেন?

আপনি এ জেলার একজন নামকরা মানুষ। লিডার।

হলামই বা। আমার ভাল লাগছে।

সবার সবকিছু ভাল লাগতে নেই। আপনি ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন। আমি উঠবো এবার—

তোমার ভাল লাগছিল না মায়া?

জীবনলাল কথায় কথায় সামান্য সরে দাঁড়ানোয়—সেই ফাঁকে উঠে দাঁড়িয়েই মায়া প্রথমে খোঁপা ঠিক করে নিতে নিতে আয়নায় নিজেকে দেখলো। সেখানে তার পাশে জীবনলাল চট্টরাজের হাঁটু থেকে কাঁধ অব্দি ভেসে উঠেছে। ডান হাতের থাবা আয়নার ভেতর থেকেই যেন বেরিয়ে এসে মায়ার কোমর ধরতে গেল।

মায়া ধরা দিল না। সরে গিয়ে চাপা গলায় বলল, আমার কি হচ্ছিল জেনে কি হবে!

ইজিচেয়ারের হাতল বাঁচিয়ে এক ধাপ এগিয়েই দুই থাবায় মায়াকে ধরলো জীবনলাল—কোমরের পেছনে।

ছাড়ুন। ছাড়ুন বলছি। মাঠ থেকে ওই যে কাজের লোক আসছে—

এসব কথায় কান দিল না জীবনলাল। ওরা আমাকে জানে। আমি

জানতে চাই তোমাকে—বলতে বলতে ভারি মাথা সুদ্ধ মায়ার গলার কাছে মুখ নামিয়ে আনল জীবনলাল চট্টরাজ। এ জেলায় স্বাধীনতার আগে থেকেই বহু পরিচিত নাম। স্বাধীনতার পরে তো জীবনলাল চট্টরাজ একটি রীতিমত নাম।

এবারও মজবুত, ছোট্ট যন্ত্রটি তার মাথা, মুখ, ঠোঁট সময়মত সরিয়ে নিল। চাঁদমারি না হওয়ায় মায়া দেখলো, সে মুখে একই সঙ্গে রাগ, আগ্রহ, অপমান পাশাপাশি খেলছে। জীবনলালের দুই থাবার আঙটায় পেছন টানে প্রায় হেলে গিয়ে মায়া বলল, আচ্ছা—এত অস্থির কেন?

অস্থির হব না? আমার কি তোমার মতো সময় আছে নাকি!

আমারই বা সময় কোথায় বলুন? আমি একজন ডাক্তার—

আপনি আপনি করবে না মায়া।

হাজার হোক বাবার বন্ধু ছিলেন তো!

ওকথায় না গিয়ে জীবনলাল মায়ার আগের কথাটাই ধরলো, সেজন্যেই তো পার্টি এবার বাই ইলেকশনে তোমায় টিকিট দিয়েছে—

পার্টি নয়। দিয়েছেন আপনি। আপনার ইচ্ছেতেই আমার ভোটে দাঁড়ানো। কিন্তু জিতলেও বিধানসভায় গিয়ে তর্ক করে আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। আমার প্র্যাকটিসের সময়ের দাম নেই?

মায়াকে আলগোছে ছেড়ে দিয়ে বাঁ পায়ের সু-জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে ডান পা খানিক শূন্যে তুলে এক চক্কর ঘুরে নিয়েই জীবনলাল বলল, তুমি জিতবে। জিতলে তোমার প্র্যাকটিস এমনিতেই বেড়ে যাবে। পার্লামেন্টের ভোটের সঙ্গে বিধানসভার বাই-ইলেকশন করলে সেই তোড়ে বিধানসভার ভোটের কাজ হয়ে যায় অনেকটা। আমি তো লোকসভা সিটে দাঁড়িয়ে তোমারও ভোটের কাজ এগিয়ে দিতে দিতে চলেছি।

দেখুন কি হয়।

কোনো পোর্ট্রেট আর্টিস্টের কাছে সিটিং দেবার কায়দায় পুরনো ফ্যাশনের চ্যাপ্টা চেয়ারটায় বসে বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে দিল জীবনলাল চট্টরাজ। মায়ের দিকে ডান পায়ের সু-জুতোর ডগা। পায়ের সঙ্গে এঁটে থাকা ট্রাউজার। কোমরে বেল্ট। হাত গোটানো নীল শার্টের ওপর ওয়েস্টকোট—জিনসের—তার বাঁদিকের নিচের পকেটে চশমার খাপের মাথা বেরিয়ে। হাসি হাসি মুখের নিচের দিকটায় কাঁচা পাকা দাড়ি—কপালে ঝুলে পড়া চুল—চওড়া দুই কাঁধ গলায় দু'দিকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকটা। আগেকার চেয়ারের কার্নিস

জীবনলালের কোমরের সামান্য ওপরে উঠেই ফুরিয়ে গেছে।

মায়া দেখলো, জীবনলালের বাঁ চোখে বাইরের আলো জানলা দিয়ে ঢুকে লাফিয়ে পড়েছে। ডান চোখটা দেখা যাচ্ছে না। সেখানে বাগানের কদ গাছের ছায়া। কাছে এসো মায়া—এরকম একটা চাওয়া মানুষটার চোখে-মুখে অস্থির হয়ে খেলছে। আর ভেতরবাড়ির উঠোন শেষে যতদূর দেখা যায়—ধানক্ষেত। সেখানকার আকাশ বেলা ছোট হয়ে আসার ফিকে আলোয় গম্ভীর।

মায়া বলল, আমার ভয় করে। এভাবে লুকিয়ে বাসে করে আসি—যেন ভোটের কাজে বেরিয়েছি—

রোগী দেখতে বেরিয়েছো—ভাবতে পারে লোকে।

তা পারে। কোনদিন ধরা পড়ে যাবো।

ধরা পড়ার তো কারণ নেই কোনো। তুমি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেই পারো। আমরা একই পার্টির লোক।

লোকের তো সন্দেহ করতে আটকাবে না। বলতে পারে—শহর থেকে এতদূরে এসে কিসের অ্যাতো দেখাশুনো ?

করুক না। পাবলিকের কাজে নামলে লোকনিন্দা কি আটকানো যায় মায়া ?

এটা কি পাবলিকের কাজ ! এই যে এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে আসা ?

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জীবনলাল, পাবলিকের কাজ তো বটেই ! আমি তোমার পেসেণ্ট। তুমি ডাক্তার হিসেবে দেখতে এসেছো আমায় ! এমনই ডাক্তার—যাঁকে না দেখে রোগী থাকতে পারে না !! ঘন ঘন দেখতে মন চায় রোগীর !!!

এই বুঝি আপনাদের পার্টির ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ?

জীবনলাল কাছে এগিয়ে এসে বলল, বুঝেছি। বাসে এই দুপুর দুপুর আসতে বড্ড কষ্ট হয়েছে। চল আমার সঙ্গে ফিরবে।

তাহলে টি টি পড়ে যাবে যে। আপনার সঙ্গে টাঙ্গায় এতটা পথ নির্জনে নির্জনে পেরিয়ে শহরে যখন ঢুকবো তখন ওরা শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল বের করবে। আপনার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে গান বাঁধবে।

জিভ ছিঁড়ে নেবো না।

তাতে তো কেলেঙ্কারী বাড়বে। আমি একা একাই ফিরবো। বলুন এবার—কি জন্যে এখানে এসে দেখা করতে বলেছেন ?

শহরে তোমায় দেখে দেখে আমার আশ মেটে না মায়া। এত লোক—এত ভিড় থাকে।

ছোটবেলা থেকেই তো আমায় দেখে আসছেন।

সে-দেখা আর এ-দেখা আলাদা মায়া। কেন জেনেশুনে আমায় অপমান করছো। শেষের দশ বারো বছর দেখিনি তোমায়। অমিয় মারা গেল। আমি তখন দিল্লিতে। ক'মাস পরে ফিরে এসে শুনলাম—কলকাতা থেকে অমিয়র মেয়ে শহরে ফিরে চেম্বার করে বসেছে রেল গেটের মুখে। তাও তো চার পাঁচ বছর হয়ে গেল।

এসব কথা তো আগেও অনেকবার বলেছেন।

আবারও বলছি মায়া। কি হবে মায়া ভোটে জিতে? চল না আমরা কোথাও চলে যাই।

দেশসুদ্ধ রটাতে চান?

তোমার সামনে এখনো অনেক সময় মায়া। কিন্তু আমার যে আর সময় নেই। কি হবে স্লোগান দিয়ে? কি হবে মন্ত্রী হয়ে? রটে তো রটুক না।

পারবেন? পারবেন আপনার শহরের বাড়ি—সংসার—জমিজায়গা—নামডাক—সব—সব ছেড়ে দিয়ে?

পারবো। পারবো মায়া। আমি তো তোমায় পাবো। তোমার ভেতরে ডুবে যাবো। তোমাকে জানবো।

অন্ধকার হয়ে আসা বিকেলে মায়া ঠোঁট ওলটালো। লোকজন কাজ ছেড়ে উঠে আসছিল এদিনকার মতো।

ঠিক এই সময়ে বাইরে মাঠের দিক থেকে চিৎকার উঠলো। দাপাদাপি। মানুষের হুড়োহুড়ি! জীবনলাল ছুটে বেরিয়ে এসেই চেঁচিয়ে উঠলো, ঘোড়া ছেড়ে দিল কে?

পেছন পেছন মায়া এসে দেখলো, ঘন ধান অন্ধকারে মিশে যাবে যাবে—সন্ধ্যার প্রায় এই সময়টায় ছাড়া পাওয়া ঘোড়াটা লম্বা লম্বা লাফে মাঠ পেরোচ্ছে। ধানক্ষেত দাপিয়ে। আর তার পেছনে পাঁচ ছ'জন কিষাণ ছুটছে ধরবে বলে।

মালী মতো একজন ফট করে বারান্দার সুইচ টিপে আলো জেলে দিতেই—জীবনলাল তার দিকে মারমুখো হয়ে ছুটে গেল—বল। কে ছেড়েছে বল?

আজ্ঞে ফেলু।

ফেলু? কোথায় সে? ধরে নিয়ে আয়—চাবকে—

মায়াদের পেছন থেকে শান্ত ঠাণ্ডা গলায় কে বলল, এতক্ষণে অনেক দূরে পালিয়ে গেছে—

জীবনলালের সঙ্গে সঙ্গে মায়াও ঘুরে তাকালো।

সাধারণ শাড়ি পরা এক মহিলা। মাথার চুল সাদা। চোখের দৃষ্টি আবছা আবছা। মহিলার মাথার পেছন দিয়ে আশ্বিনের আকাশের যেটুকু বারান্দায় ফাঁকে চোখে আসে—তার সবটাই লাল, গম্ভীর—অন্ধকারে মুছে যাচ্ছিলো।

জীবনলাল বলল, ওঃ! তুমি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এক এক সময় এক এক দল মানুষ ওঠে। আরেক দল মানুষ পড়ে যায়। টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, ক্ষমতা চিরকালই আছে—থাকবেও। শুধু সময়মত একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে চলে যায়। এক একটা সময় আসে যখন শুধু বাতাসের ভেতরেও আশার আলো দেখা যায়। গাছের একটা পাতা খসে পড়লে মনে হয়—এই বুঝি এর ভেতর ভালো কিছুর ইশারা রয়েছে।

পৃথিবীর এরকম একটা সময়ে জেলা সদর শহরের কানাৎ ঘেঁষে গাছ-গাছালি ঘেরা একতলা বসতবাড়ির উঠোনে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে শীতের এক সকালে তখনকার দুই যুবক বসে। তিরিশ ঘেঁষে বয়স। ঝকঝকে রোদ্দুর। দু'জনের গায়েই র‍্যাপার। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি।

একজন বলল, এখন স্বাধীন দেশ। স্বাধীন ব্যবসাই করবো।

অন্যজন বলল, তোর সুবিধা আছে। আইনটা পাশ করে নিয়েছিস।

তখন বললাম—জেলে বসেই পরীক্ষাটা দিয়ে দে জীবন—তো হাঙ্গার স্ট্রাইক করে শেষে হাসপাতালে গিয়ে আটকে গেলি তিনটে মাস।

দেশটা যে এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়ে যাবে—ভাবতেই পারিনি অমিয়। এখন জায়গাজমি সামলাবো? না, পড়বো? তার ওপর বাবা বিয়ে দিয়ে গেছে আমার—

তাতে কি? আমিও তো ম্যারেড। আমাদের মতো অবস্থা নয় তোদের জীবন। ভাতওয়ালা বাড়ির ছেলে তোরা। জমি আছে তোদের। পণ্ডিতজী তো পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন—সব গাঁয়ে ইলেকট্রিক যাবে—সেচের জন্যে খাল কাটাবেন—জল ধরে রাখা হবে—বছরে একই জমিতে দোবারা ফসল ফলবে। দামোদর বাঁধ হবে।

বছরে দু'টো ফসল ?

হুঁ। অবাক হবার কিছু নয়। অনেক দেশেই তো হয় জীবন। একদিন দেখবি ইণ্ডিয়া ফুড এক্সপোর্ট করবে।

ভুলিসনে অমিয়—ভূমি সংস্কারের কথা আমরা বলে এসেছি এতদিন। জমি কিন্তু রাখা যাবে না বেশি। ভূমিহীনকে আজ হোক—কাল হোক—জমি দিতেই হবে অমিয়।

সংস্কার তো হবেই। জমিও কমবে। কিন্তু ভালো সেচ—বছরে দোবারা ফসল—তখন দেখবি উনো জমিতে দুনো ফসল অনেক লাভের হবে। সব মানুষের মুখে হাসিও ফুটবে। অভাব থাকবে না।

আমি অনেক জমি বিলি করে দিয়েছি। বাবা বেঁচে থাকলে হার্টফেল করতেন অমিয়।

তোর দাদা ?

তিনি আঁকড়ে আছেন। অবিশ্যি—জমি ছাড়া তাঁর সংসারই বা চলবে কিসে ? আমি না হয় যাহোক করে চালিয়ে নিতে পারবো নিজেকে—

উঠোনে নেমে এসে অমিয়-গিন্নি বলল, আজ এখানে ভাত খেয়ে যাবেন ?

সেকথায় কান না দিয়ে জীবনলাল জানতে চাইল, এ শাড়িটা কিনলেন কোত্থেকে শান্তি বৌদি ? এখানকার নিশ্চয় নয়।

আপনার তো সবদিকে নজর আছে। খাদির দোকান খুলেছে সরকার কলকাতায়। সেখানে মায়ার জন্যে খেলনা কিনলাম। তখন পছন্দ হয়ে গেল শাড়িটা।

অমিয় এসব কথায় কান দিল না। সে আগেকার কথার খেই ধরেই বলল, জমি যে বিলি করলি—তা সেখানকার ভাগচাষীরাই পেয়েছে তো ?

তাদেরই দিলাম। তাদের ছাড়া কাদের দেব ? কয়েক পুরুষের সম্পর্ক। কী ভালোবাসে দেশগাঁয়ের মানুষ। সব খবর রাখে। এতদিন যে মাঝে মাঝেই জেলে যেতাম—সব জানে। এক বুড়ি দেখলাম—আমার নাম করে পাঁঠা পোষানী দিয়েছে।

পাঁঠা ? সে আবার কি ?

আমি জেলে যাবার পর তার ছাগল বাচ্চা দেয়। বড় ইচ্ছে—আমার নাম করে বড়-করা পাঁঠার মাংস যেন আমি খাই।—এখানে একটু থেমে জীবনলাল বলল, ভাখ অমিয়, কু-লোক—পাতি বুর্জোয়া—যেসব কথা বলে একদল আমাদের মার্কা মেরে দিতে চাইছে—হাওয়া বিষিয়ে তুলছে—আমাদের

দেশে কোনোদিন কিন্তু বাতাস অতটা বিষাক্ত হবে না।

সেটা আমাদের বাতাসের গুণ জীবন। সেটা আমাদের মাটির গুণ। কিন্তু গান্ধীজীর রামরাজ্য দিয়ে তো বিরাট ভিসপ্যারিটি সামলানো যাবে না! যাবে না সরকারি ক্ষতিপূরণ দিয়ে ল্যাণ্ড রিফর্ম সামলানো!! তাহলে তো ছাপাখানা খুলে নোট ছাপতে হয়—

তাহলে তুই কি মনে করিস অমিয় ?

এমন করে কথাটা ছুঁড়ে দিলে জীবনলাল—যেন কথাগুলোর ছাল ছাড়িয়ে ভেতরকার খোসা, বীজ, সবই বেছে বের করে ফেলার দায়িত্ব অমিয়র। অমিয় ভূষণ। পুরো নাম—অমিয়ভূষণ পালিত।

অমিয় হেসে ফেলল। আমি কি তোদের তাত্ত্বিক ?

তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে বলে আসছিস—

এই শেষ কথাগুলো প্রায় বিড় বিড় করে রিপিট করছিল জীবনলাল—নিজের ঠোঁটে। তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে বলে আসছিস—তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে বলে আসছিস—

আশ্চর্য। একঘোড়ার টাঙ্গায় দুলকি কদমে এই কথা কটাই চাকায় রবার পিচরাস্তা থেকে বারবার ঘষে টেনে তুলছে। তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে বলে আসছিস—

এখানে থামুন—আমি নামবো।

বাঁ হাতে লাগাম টানলো জীবনলাল। আশ্বিনের সন্ধ্যেরাতের অন্ধকার পিচরাস্তা। সোজা চলে গেছে জেলা সদরে। অমিয় নয়—অমিয়র ডাক্তার মেয়ে একটা গাছতলা মতন জায়গায় টুক করে নেমে গেল। অমিয় নেই—তাও তো অনেকদিন। একা অন্ধকারে এখানে কতক্ষণ দাঁড়াবে মায়া ?

যতক্ষণ বাস না আসে—

বাসের দেরি হতে পারে মায়া। তুমি উঠে এসো। শহরে ঢোকার অনেক আগেই তোমায় নামিয়ে দেব।

আপনি যান। ভোটে যখন দাঁড়িয়েছি—বাসের জন্যেও দাঁড়াতে পারবো।

টাঙ্গার ওপর থেকে জীবনলাল বলল, তুমি সেই থেকে আমায় আপনি আপনি করে চলেছো—

ওসব কথা পরেও ঠিক করা চলবে। আপনি এগিয়ে যান। ওই তো বাসের হেডলাইট—আর এদিকে অনেকেই আমার পেসেণ্ট।

অগত্যা—। শহরের দিকে এগোতে এগোতে ঘোড়া আবার তার দমে

ফিরে এল। সেই চাল। সেই দুলকি। আকাশে তারারা ফুটেছে। বাঁ হাতে একসময়কার জ্যান্ত নদী কালীগঙ্গার মড়াঘাট এখন। ঘোড়াটার বয়স আট। আমার ছাপ্পান্ন কি সাতান্ন। দূরের শহর এবার দোকানপাট—ছবিঘর—রাস্তার আলো নিয়ে ঝলমল করে উঠবে। নদীর গা দিয়ে বসানো নয়া বসত—অমিয়নগর—ডান হাতে অক্ষয়কালীর মোড়—সেবার অমিয় মারা গেলে পার্টি থেকে খাস জমিতে লোক বসানোর সময় জীবনই জায়গাটার নাম দিয়ে দিয়েছিল অমিয়র নামে—এখন তো চিঠি আসে—ডাকঘর : অমিয়নগর।

আবার সেই—তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে বলে আসছিস—আমি কি তোদের তাত্ত্বিক ?

ঘোড়ার খুরে। চাকার চক্করে। তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে বলে আসছিস আমি কি তোদের তাত্ত্বিক ?

জীবনলাল চট্টরাজ, একা একা চলন্ত টাঙ্গায় গেয়ে উঠলো—অন্ধকারে—

ভাসিয়ে দিলেম মালা
তবে যাই চলে-এ-এ

দু'পাশে ফাঁকা অন্ধকার মাঠ। পেছনে গাছতলার বাসট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকলো মায়া। তাকে দূরে ফেলে ফেলে টাঙ্গা শহরের দিকে ছুটছে।

ভাসিয়ে দিলেম মালা
তবে প্রিয় যাই চলে-এ
তুমি যদি আসবে না
এ মালা নেবে না গলে-এ
তবে প্রিয় যাই চলে-এ

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে গিয়ে জীবনলাল টের পেল, এ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখেই ঘোড়াটা ছুটছে। আর সেই সুরেই ঘোড়ার খুরের সঙ্গে, চাকার চক্করে চক্করে অমিয়র কত আগে বলা কথাগুলো সুর পালটে একই ধুনে লাট খেতে শুরু করেছে। সেই তুই-ই তো চিরকাল বুঝিয়ে আসছিস—আমি কি তোদের তাত্ত্বিক ?

সারাদিনের চাপধরা ভেপো বাতাস কাটিয়ে টাঙ্গা ছুটছে বলেই খোলা বুকে মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা ভীষণ ভাল লাগছে জীবনলালের। এ গানটা কাননদেবী অশোককুমার গেয়েছিল। স্বাধীনতার অল্পদিনের ভেতর। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরে। আরও কী সব লাইন ভেসে ভেসে আসছিল তার মাথায়। প্রায় চল্লিশ বছর পেছন থেকে—

তোমারে সুরভি সম

দূর হতে পাব বলে

রতন টকিতে অমিয়কে নিয়ে জীবনলাল ছবিটা দেখেছিল। সন্ধ্যের শোয়ে। পরিষ্কার মনে আছে। সামনেই ছিল পঞ্চায়েত ইলেকশন। পার্টির ডিস্ট্রিক্ট একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার তখন দু'জনেই। স্বাধীন ভারতে প্রথম পঞ্চায়েৎ। গান্ধীজী ক'মাস হলো নেই।

ধরা দিনু আজ

তবু কেন ভয় মানি গো—

নয়নে নয়নে জানি গো

খুবই অবাক হলো জীবনলাল। যে গানই গাইছে—তাই-ই মিলে যাচ্ছে চাকার চক্করে। আজ তার গানের গলা খুলে গেছে। কতকাল পরে।

তুমি যদি আসিবে না

এ মালা নেবে না গলে

তবে নিয়ে যাই চলে

ভাসায়ে আঁধার জলে-এ-এ

দেখতে দেখতে টাঙ্গার মুখে শহর এসে গেল। তখনো জীবনলালের গলায় অশোককুমারের চল্লিশ বছর আগের গান—

তোমারে সুরভি সম

দূর হতে পাব বলে—

মফঃস্বলের জেলা শহরের সন্ধ্যেবেলা। শহরের পাড় ধরেই ধানক্ষেত। বর্ষা চলে গিয়ে মাঠঘাট আকাশ ক'দিন সবে গম্ভীর হয়েছে। অঘ্রাণের শেষা-শেষি ভোট। তাই একদিকে ক্লান্তি। আরেক দিকে ভোটাভুটির চাপা পাঁয়তারা।

এরই ভেতর সাইকেল রিকশার লম্বা লাইন, পুলিশের জিপ, ভেটেরনারি ডাক্তারবাবুর অস্টিন—কলেজ মাঠে যাবার দিককার রাস্তাও জ্যাম। সে দিকটা এড়িয়ে একটু সরু অন্য বাঁহাতি পথটা ধরতেই জীবনলালের টাঙ্গা একজোড়া স্কুটারের পেছনে পড়ে গিয়ে প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়েই দাপাতে লাগলো। তখনো জীবনলালের গলায় পুরো দস্তুর গান। তবে গানটার ডান হাতার সঙ্গে বাঁ পকেট জুড়ে গেছে—একদম এলোমেলো সুরে—

তোমারে সুরভি সম

দূর হতে পাব বলে-এ-এ

ভাসায়ে আঁধার জলে

এ মালা নেবে না গলে-এ-এ

নয়নে নয়নে জানি গো—

ও জীবনদা। তোমায় তো গানে পেয়েছে—

চমক ভাঙলো জীবনলালের। রাস্তার পাশে মতি স্যাকরা লোহার জালের ওপাশে বসে হাসছে। সারা শহরে সন্ধ্যেরাতের ঝাঁপ। ওই যে বাস এসে ঢুকলো শহরে। যাক! বেশ নিশ্চিন্ত গলায় জীবনলাল টাঙ্গায় বসেই চেঁচিয়ে বলল, কাজের কদ্দুর?

কবে হয়ে পড়ে আছে!

বাণী কিন্তু বাড়াবে না মইন্তা—

যা দিয়ে থাকো। জীবন-চটিতে দে আসব।

না না। আমিই আসবো। গালা ভরোনি তো বেশি?

যেমন যা—ঠিক তেমনি। আমি জানিনে—!

জীবনলাল দেখলো, তার চওড়া কবজিতে রেডিয়াম ডায়াল হাতঘড়িটায় পৌনে আটটা বাজে। সে ছিপটি মেরে ঘোড়ার মুখ জীবন-চটির দিকে ফেরালো।

বাবা চেয়েছিল, জীবনলাল একজন আদর্শ রাজভক্ত প্রজা হোক। প্রজা মানে জমিজিরেতের প্রজাদের তাশন-দমন জমিদার। চাইকি যুদ্ধ বাধলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজের ওয়ারফাণ্ডে জীবনলাল মোটা চাঁদা দেবে। গান্ধীর চেলাদের টিট করে জেলাশাসকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাবে। চাই কি রায়বাহাদুরও হয়ে যেতে পারে বয়সকালে।

জীবনলাল স্কুলের উঁচু ক্লাশে উঠেই গান্ধীজীর ডাকে কিশোর বয়সে কংগ্রেসের চার আনার সদস্য হয়ে পড়লো। তখনো কালীগঙ্গায় সম্বচ্ছর জল থাকতো। জীবনলালের বাবা জায়গাজমির ফসল-আনাজপাতি, গুড়, খড়, মুগমসুর—সবই নৌকোয় ভাসিয়ে অক্ষয়কালার মোড় অব্দি নিয়ে আসতেন। সেখান থেকে মড়াঘাটে মোতায়েন গো-গাড়িতে জিনিসপত্তর তুলে দেওয়া হতো।

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর প্রার্থী। শান্তিনিকেতন থেকে মাস্টারমশাই এসে তোরণে, মঞ্চে ছবি আঁকলেন মনে আছে জীবনলালের।

পরের বছর ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র নিজেই প্রার্থী। অমিয় আর সে তখ ওদিকেই ঝুঁকেছে।

কী এক উত্তেজনা। সারা ভারতবর্ষের জেলা কংগ্রেস সভাপতিরা ভো দেবে তো? না দিলে সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি হওয়া মাঠে মারা যায়। শে অব্দি তরী ভিড়লো তীরে। ওঁর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনলাল জেলাশহ ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলে। তখন থেকেই শার্ট ট্রাউজার তার সর্বক্ষণে উর্দি হয়ে পড়ে। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে দেশের মানুষ তাকে মেজর চট্টরাজ বলে ডাকতো। ভলান্টিয়ারি করতে গিয়ে খানিকটা মিলিটারি সহবৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিল জীবনলালের।

এ জেলায় নদী আছে। আছে লালমাটি। জমি চষতে বলদ যেমন আছে —তেমনি আছে একঘোড়ার লাঙল। আর সদর শহরে কোথাও কোথাও ধেনো মাঠের কানাৎ রেফ হয়ে ঢুকে পড়েছে। আবার বাজার এলাকায় বহুতল বাড়ির মুণ্ডু সিধে আকাশে।

সন্ধ্যেরাতের আলোয় শহরের খানিকটা দেখা যায়। খানিকটা দোকান পাটের আবছা আলোয় আবছা মতো। ডাকবাংলোর মোড় থেকে বাসগুমটি বাঁয়ে রেখে জীবনলাল ঘোড়ার মুখ ফেরালো জীবন চটির রাস্তায়।

আগে এই দিকটা ফাঁকা ফাঁকা ছিল। এখন এই চল্লিশ বছরে স্বাধীনতার পর থেকে আস্তে আস্তে অনেক নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। বাড়িগুলোর শেষে জীবন-চটি।

তার বাবা বেঁচে থাকতে ও বাড়িকে সবাই বলতো চট্টরাজ বাড়ি। তারপর বাবা চলে যেতে লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে ও বাড়ির নাম এখন—জীবন-চটি

এখনকার পক্ষে অনেকটা জায়গা নিয়েই বাড়িটা। দোতলায় আলো জ্বলছিল। টাঙ্গা থামতেই ছুটে এসে লাগাম ধরলো মহেন্দ্র সহিস। টকা করে লাফ দিয়ে নামলো জীবনলাল।

নেমেই সিধে বাড়ির পেছন দিককার কুয়োতলায়। লালচে বিচির একটা পোয়ারা গাছ দিনের বেলায় ছায়া দেয় কুয়োর পাড়ে। তারই ডালে জামা প্যান্ট ঝুলিয়ে দিয়ে খালি গায়ে জাঙ্গিয়া পরনে জীবনলাল পরপর তিনটে বৈঠক দিয়ে দেখলো।

ঘোড়া বেঁধে দিয়ে মহেন্দ্র ছুটে এল। দাঁড়ানো জীবনলালের পা থেকে জুতো খুলতে খুলতে বলল, সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরেছেন ভাল। ওরা কিন্তু বেমক্কা পেলি তোমায় খুন করে দেবে—

জুতো থেকে পা দু'খানা বের করে এনে জীবনলাল জানতে চাইল, ওরা কারা ?

ওই এগনেস্ট পার্টি—

ওঃ !—বলে কুয়োর জল ধরে রাখা বালতিতে মগ ডুবিয়ে মাথায় ঢালতে লাগলো জীবনলাল—আর সেই সঙ্গে খোলা গলায় গীতা থেকে পড়পড় করে সুরে বলে যেতে লাগলো।

মহেন্দ্র তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলো না। বুঝতে পারছিল যে—সে তখন অন্ধকার একতলায় বসে। এইমাত্র কলকাতা থেকে ট্রেনে ফিরেছে। দোতলায় ওঠার মুখে গীতার চেনা সর্গ কানে ঢুকতেই অচিন্ত্য বারোয়ারি বেঞ্চটায় বসে পড়েছে।

বসে মনে মনে জীবনলালকে তারিফ দিচ্ছিল অচিন্ত্য অন্ধকারে। বেশ মৌজে আছে তো বাবা। সামনে আর দেড় মাস মোটে। তারপরেই ভোট। এখন গীতা আওড়াচ্ছে চান করতে করতে। এই বয়সে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন—আমি তোমার জন্যে শত্রুকে তো মেরেই রেখেছি। এবার তাকে তুমি বধ কর। তোমার হাতে বধ হবার জন্যেই ওর জন্ম।

সামনের ভোটযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে নিজের গা গরম করার জন্যেই কি বাবা গীতাকে ব্যবহার করছে ? জীবনে সবসময় এত স্বাদ পায় কোত্থেকে মানুষটা।

বাড়ির পেছন দিকে কুয়োতলার ঠিক মাথায় মাথায় দোতলায় অনেকগুলো জানলা। সেখান থেকে এক মহিলা একটা ধবধবে সাদা পাজামা পায়রার মতো নিচের দিকে উড়িয়ে দিলেন, খোকাপনা করে চান তো করলে। রাতে দাঁতে ব্যথা হলে মাঝরাতে গরম জল করে দিতে পারবো না—

পাজামাটা বাঁ হাতে লুফে নিয়ে গীতা আওড়াতে আওড়াতেই পরে নিল জীবনলাল। তারপর ভিজে মাথায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কে বসে ?

আমি বাবা—

চিনু ? কখন এলে ? ওপরে এস—

তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

জীবনলাল সিঁড়িতে উঠলো না। বরং নেমে এসে ছেলের মুখোমুখি দাঁড়ালো। রাস্তার যেটুকু আলো এসে পড়েছে তাতে জীবনলাল চিনুর বুকের আন্দাজটা পেল। বুক খোলা পাঞ্জাবির ভেতর থেকে হাড়েমাসে বুকটা উপত্যকা হয়ে জেগে। চোখ দেখা যায় না। চোখের গর্তটা টের পায়—

কাগজ দেখলাম—তোমাদের ক্যাণ্ডিডেটরা তো কেউ টিকিট পায়নি।

হুঁ।

ও পার্টি আর করছো কেন? পার্টি তো কবে মরে গেছে চিনু—

চিনু গোড়ায় কোনো জবাব দিল না। সে তার বাবার ভিজে গা থেকে একটা চেনা জন্তুর গন্ধ পাচ্ছিলো। কিন্তু কিছুতেই সে জন্তুর নাম মনে আসছিল না। ফট করে মনে পড়ে গেল—ঘোড়া। ঘোড়া ভিজলে বা ঘামলে দাবনা দিয়ে এই গন্ধ ওঠে।—ওপরে গিয়ে গা মুছে নাও বাবা।

সে আমি মুছবো'খন! গা মুছবো। মাথা আঁচড়াবো। ভিজে দাড়ি পাখা চালিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তবে আঁচড়াবো। কিন্তু তোমাদের পার্টি—মনে রোখো—আর বেঁচে নেই।

আমাদের পার্টি মরিয়াও না মরে বাবা। একশো বছরের ওপর মনীষীদের বেঁধে দেওয়া রাস্তা দিয়ে পার্টির রথ চলেছে। আরও একশো বছর চলবে।

ওপরে উঠতে উঠতে জীবনলাল বলল, সেই আশাতেই থাকো! কী সব নেতা তোমাদের এক একজন!

ওদের দেখে মানুষ ভোট দেয় না আমাদের। ভোট দেয় আমাদের এক সেঞ্চুরির পলিসি দেখে! তুমিও তো একসময় এ পার্টি করেছো বাবা।

তখনকার পার্টি আর এখনকার পার্টি? আকাশ পাতাল ফারাক চিনু।

আমাদের পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সবাই হারিয়ে যায়। তোমরাও হারিয়ে গ্যাছো বাবা।

আমরা হারিয়ে গিয়েও আলাদা আছি। কলকাতায় কোয়ালিশন করেছি আমরা। দিল্লীতেও একদিন ন্যাশানাল কোয়ালিশন গড়বো আমরা—দেখে নিও। এবার তো মোহভঙ্গ হলো। এবার এম. এ পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। আর কত সময় নষ্ট করবে?

একথার কোনো জবাব দিল না অচিন্ত্য। জীবনলাল ওপরে উঠে যেতে সে নিচের চাউস বৈঠকখানার আলোর সুইচটা আন্দাজে খুঁজে বের করে টিপলো।

এই ঘর একসময় ছিল অচিন্ত্যর ঠাকুরদার বৈঠকখানা। তখন নাকি দেওয়াল জুড়ে থাকতো রাজারানীর ছবি। এখন সেখানে বিবেকানন্দ, নেতাজীর ছবি। আর একখানা ছবিতে ঘোড়ায় বসা জীবনলাল—যৌবনের জীবনলাল। গায়ে ফৌজি উর্দি। নিচে লেখা—মেজর জীবনলাল চট্টরাজ, বি. ভি। ভি কথাটার মানে ভলান্টিয়ার্স।

জানলা দিয়ে তাকালে পেছন বাড়িতে কুয়োতলা, পেয়ারা গাছ। আজ চার মাস পরে অচিন্ত্যর বাড়ি ফেরা। এ ক'মাস কেটেছে পার্টি ক্যাণ্ডিডেটদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক। নাম ঠিক করা। তারপর ফাইনাল করে লিস্ট পাঠানো হয়েছিল দিল্লীতে। দিল্লী বেছে বেছে অচিন্ত্যদের তিরিশজন মতো ক্যাণ্ডিডেটের নাম কেটে দিয়ে এমন সব নাম বসিয়েছে—যারা কোনোদিনই পার্টির দুঃসময়ে রাস্তায় নামেনি—পতাকা ঘাড়ে করেনি।

মুখের ভেতরটা তেতো লাগলো অচিন্ত্যর। সাড়ে চার ঘণ্টার মতো ট্রেন জার্নিতে শরীরটাও ক্লান্ত। সামনে তাকিয়ে সবই অন্ধকার লাগে অচিন্ত্যর। কোনো আলো নেই। কোনো আশা নেই। পার্টিতে এতদিন-কার পরিশ্রম সবই জলে গেল। হাইকমাণ্ড অচিন্ত্যদের কোনো প্রার্থীকেই ক্যাণ্ডিডেট করেনি।

এই অবস্থায় ভোটে ভরাডুবি নির্ঘাৎ। আর ভোটের পর তো পার্টি রাখাই কঠিন হবে।

'ও চিনু—তুই এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন? ওপরে আয়। কতদিন পরে এলি।

তুমি ওপরে যাও। আমি যাচ্ছি মা।

দুপুরে কোথায় খেলি?

কলকাতায়—হোটেলে।

হাত পা ধুয়ে ওপরে আয়—তোর ছোটমা ঘুগনি করেছে—

অচিন্ত্য কোনো জবাব দিল না। এই জেলা শহরে সে বড় হয়েছে। এখানে তার ক্লাসফ্রেণ্ডরা এখন কেউ লেকচারার—কেউ বা ইঞ্জিনীয়ার। মায়া তো কয়েক বছর হলো ডাক্তার। অশোক পেট্রোল পাম্পে বসে। কলেজের স্টুডেন্ট লিডার থেকে জেলায় পার্টির ছাত্র শাখার সম্পাদক—সেখান থেকে একদম কলকাতায় প্রদেশ অফিসে। কটা বছর কোত্থেকে কেটে গেছে টেরই পায়নি অচিন্ত্য। আর আজ সে সম্পূর্ণ ছিবড়ে হয়ে ফিরে এসেছে।

দোতলায় উঠে একটা ছবির সামনে একদম স্থির হয়ে গেল অচিন্ত্য। বিশাল ইজি চেয়ারে তার বাবা জীবনলাল চট্টরাজ বসে। হাতে আয়না। আর ছোটমা ভিজে চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। অচিন্ত্যর বাবার এ পক্ষের ছেলে স্কুলের পড়া ফেলে ভাঁজভাঙা পাঞ্জাবি হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়ানো। দূরের টেবিলে অচিন্ত্যর পরের বোন মাথা গুঁজে পড়ছে।

অচিন্ত্য গিয়ে দাঁড়াতেই জীবনলাল মাথা তুললো। এবার তুমি আমার

চিফ ইলেকশন এজেন্ট।

তা কি করে হয় বাবা?

কেন হবে না চিনু? নিজের বৃদ্ধ পিতার জন্যে যুবক পুত্র খাটতে পারবে না? পার্টির এ কোন শিক্ষা?

তুমি আর যা কিছু বলবে—তা আমি শুনবো। কিন্তু ভোটে তোমার হয়ে খাটা?—আমি পারবো না বাবা।

কথাও শেষ হলো অচিন্ত্যর—অমনি স্বামীর মাথা আঁচড়ানো থামিয়ে অচিন্ত্যদের ছোটমা ঘুরে তাকালো। তা পারবে কেন!

কথাটায় গোপন খোঁচা ছিল। বিশদ করলে খাওয়ার খোঁটা এসে পড়বেই। অচিন্ত্যর মুখখানা শক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। একটু আগেও বাবাকে এভাবে মাথা আঁচড়াতে দেখে সিংহের কথা মনে হয়েছিল অচিন্ত্যর। এক মহিষী মাথা আঁচড়ে দিচ্ছে। আরেক মহিষী কাছাকাছিই আছে। এক মেয়ে পড়ছে। আরেকজন ছেলে পাটভাঙা পাঞ্জাবি হাতে দাঁড়িয়ে। সিংহই এভাবে পরিবার নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থেকে সুখশান্তি উপভোগ করে।

এমন একটা ক্ল্যাসিকাল কল্পনার মাঝখানে ছোটমায়ের কথাটা বর্শা হয়ে বিঁধে গেল অচিন্ত্যর মাথায়। সে বললো, ভাখো ছোটমাসী- সবাই সব পারে না। আমি পার্টি করে এসে এত দিন পরে নিজেই সেই পার্টির বিরুদ্ধে যাই কি করে?

কতদিন বলেছি না—আমায় ছোটমাসী বলবে না চিনু—

বাঃ! তুমি তো আমার মায়ের ছোটবোন। তোমরা দু'জন মায়ের পেটের বোন।

হাতের চিরুনিখানা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অচিন্ত্যর ছোটমাসী ওরফে ছোটমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক তখনই ভোটের ভলান্টিয়াররা জীবনলালের নামে শ্লোগান দিতে দিতে জীবন-চটির গেট দিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল।

লং লিভ জীবনলাল!
ইনকিলাব জিন্দাবাদ!!
লোকসভায় জীবনদা
বিধানসভায় মায়াদি
ইনকিলাব জিন্দাবাদ!
ইনকিলাব জিন্দাবাদ!!

যে কোন শহরেরই বাইরেটা উদাস উদাস লাগে। ডিস্ট্যান্ট সিগনাল। বাস রুট। ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে আরেক দিগন্তে চলে যাওয়া সব রাস্তা। সেসব রাস্তায় কখনো ম্যাথরপাড়া থেকে শুয়োরের পাল চরতে বেরিয়ে পড়ে। কখনো বা আরেক জেলার বাউল সে রাস্তা দিয়েই জেলা সদরে ঢোকে। সূর্য সে পথের শেষে গোল হয়ে ডোবে। চাঁদ গোল হয়ে ওঠে।

বড়লাইনের ওপর দিয়ে গুডস ট্রেন চলে গেল মেইন্ লাইনে। আর তখনি সেহেরাবাজার থেকে লাইট রেলের ইঞ্জিনটা হাসতে হাসতে জেলা শহরে ঢুকলো। তার পেছনে ছ'খানা প্যাসেঞ্জার কামরা। রাস্তা থেকেই দেখা যায় —বগি ভর্তি তরিতরকারি, খোলের বস্তা, দুধের কাঁড়া।

কালীগঙ্গার গা দিয়ে অমিয়নগরের শেষ। অক্ষয়কালীর মোড়ে বাস স্টপ। জায়গাটা এখন নির্জন। দূর থেকে দেখা যায় দুই বয়সের দুই মহিলা বেড়িয়ে ফিরছে। কাছে গেলে দেখা যেতো—ওদের দু'জনেরই শাড়ি পাড়ে চোরকাঁটা বিঁধে আছে। কার্তিকের ভোরবেলায় লাল রাস্তায় গায়ে ঠাসা সবুজ ঘাসের মাথায় মাথায় শিশির। ওরা এইভাবে কথা বলছিল—

তোর বাবা তো কত ভোটে দাঁড়িয়েছে। এত কলঙ্ক তো রটায়নি কেউ?

ভুলে যেও না মা। আমি একজন মেয়ে।

মেয়ে—কিন্তু তুই তো ডাক্তার। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছিস। তোকে নিয়ে রটবে কেন? জীবন ঠাকুরপোও নবিস নয়। কতকাল ধরে পলিটিকস্ করে আসছেন—

নিন্দুকরা হ্যাণ্ডবিল ছড়াচ্ছে। খারাপ খারাপ কথা দেওয়ালে লিখছে।

ওসবে তাকাবি না মায়া। রাজা হতে গেলেই নিন্দা হয়। নিন্দাই রাজ-ভূষণ মায়া।

তোমার মতো মনের জোর যদি আমার থাকতো মা! এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। ভাবি—কেন বিধানসভায় দাঁড়াতে গেলাম। ভয় করে—

সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনবাবুকে বলিস তো—শান্তি বৌদি ডেকেছে আপনাকে—

রোদ উঠছিল। এর পর ওরা দু'জন গাছপালার ছায়ার নিচে এসে পড়লো। অমিয়নগরে আগাগোড়াই গাছগাছালি। দোতলা বাড়ি বিশেষ নেই। ইটপাতা চওড়া রাস্তা। সব বাড়ির সামনেই খানিকটা বাগান। কোনো কোনো বাড়ির মেঝে সিমেন্টের। দেওয়াল চ্যাটাই বেড়ার। ছাদে টিন বা টালি।

কিছুকাল হলো মায়ের রক্তে চিনি ধরা পড়ায় মায়া তার মাকে নিয়ে ভোর ভোর হাঁটতে বেরোয়। তার নিজেরও সারাদিনে এই সময়টাই শুধু একান্ত সময়।

শান্তি পালিতের চেহারা শরীর ছোট্টটি। কিন্তু বেশ টট্টরি। হেঁটে হেঁটে পেশী ঘামাতে পারলে রক্ত থেকে চিনি বিদায় নেবে—একথা জানার পর থেকেই শান্তি জোরে জোরে হাঁটে। সেই হাঁটার বেগেই সে বলল, বিধানবাবু তো ডাক্তারি করেও মন্ত্রীত্ব করেছেন। তুই তো আর অত বড় ডাক্তার হোসনি এখনো। তুই পারবি না কেন?

মন্ত্রী হবার জন্যে বাবা আমায় ডাক্তারিতে ভর্তি করেননি।

সে বেঁচে থাকলে তো অন্যরকম হতো। বিধান পরিষদে ডাঃ রায় ওঁকে নিয়েছিলেন। হয়তো মন্ত্রীও করতেন। কিন্তু ফট করে মরেই গেল। সে থাকলে কি আর তুই টিকিট পেতিস! সে থাকলে কি আর তুই পার্টি অ্যান্সয়ালে ডেলিগেট হতে পারতিস মায়া!

ওতেই তো আমার কাল হলো মা।

এসে গেছি। নে আর ভাবিসনে। তোর রুগীরা এসে গেছে এতক্ষণে।

মা আর মেয়েতে গাছগাছালিওয়ালা একটা একতলা বাড়ির উঠোনে ঢুকলো। অনেকটা জায়গা নিয়ে উঠোন। সিমেন্টের মেঝে। তাতে চাঁচারির দেওয়াল। ওপরে নানান ধাপে রঙীন টালির ছাদ। রান্নাঘরের দিকটায় ঘেরটোপ দেওয়া চিমনি।

অমিয় পালিত শৌখীন ছিলেন। ছাঁটা দেবদারুর কোলে ফোয়ারাও বসানো। অকালে মারা যাওয়ায় সেসব অনেকদিন হলো অচল। এখন এ-বাড়ির গা দিয়ে সদর শহর থেকে অটোরিকশা এসে সিধে সেহারাবাজার, রায়না, বুলবুলচণ্ডী অব্দি চলে যায়।

ভোর ভোর হাঁটাহাঁটির পর বাড়ি ঘিরে এই সময়টায় মায়া কিছুক্ষণ ধরে দু'একটা আসন করে। পেট, পা, গাল—এই সব যাতে তার খাড়াই লম্বা ধাতের সঙ্গে সঙ্গুত থাকে সেজন্যে সে শুয়ে শুয়ে পা তোলে ওপরে—মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে চিৎ অবস্থায় ঘণ্টা পারে মাথা তোলে।

ঠিক এই সময়টায় রুগী এসে জমতে থাকে মায়াদের বারান্দায়—উঠোনে। খানিকবাদে মায়ের সঙ্গে চা খেয়ে মায়া ভেতরের বড় ঘর পেরিয়ে নিজের চেম্বারে গিয়ে বসবে—সবে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে—তার চোখে পড়ল—এক-জোড়া গব্বর সিং।

চশমার পেছনে মায়া পালিতের চোখ কুঁচকে উঠলো। টায়ার কেটে বানানো এই অমর—অক্ষয় স্যাণ্ডেলকে মায়া আর তার ক্লাসফ্রেণ্ডরা কলেজ-জীবন থেকেই গব্বর সিং বলে ডাকে। জেলা কলেজে ছেলে ক্লাসফ্রেণ্ডরা কেউ কেউ একজোড়া গব্বর সিং টানা দু'বছর ধরে পরেও ছিঁড়তে পারতো না। বিশেষ করে একজন তো সব সময় গব্বর সিং পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতো তাকে এখানে এতদিন পরে এই ভোরবেলায় আশা করেনি ডক্টর মিস মায়া পালিত এম. বি. বি. এস, ডি. জি ও (ক্যাল) এক্স সিনিয়র হাউস সার্জন, এন. আর. এস মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটাল।

ডক্টর পালিত পর্দা সরিয়ে নিজের চেম্বারে বসেই পোর্টেবল কলিং বেলের মাথাটা ডান হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরলো। ঘরের কাজের সরলা মেয়েটি ভোরবেলা এই চেম্বারের সময়টায় মায়ার বেয়ারা হয়ে যায়। সে ছুটে এসে চেম্বারে ঢুকলো। এত জোরে বেল দিচ্ছ দিদিমণি?

অন্যদিন সরলাকে হাসিমুখে দু'একটা কথা বলে মায়া। আজ সরলা দেখলো, তার দিদিমণির মাথার চুল কয়েকটা উড়ে কপালে পড়েছে। চোখ উদভ্রান্ত।

যা তো—ওই লোকটাকে ডেকে দে আগে—

কাকে লোকটা বলছো দিদিমণি? ও তো তোমাদের চেনাজানা আপনজন।

ডেকে দে আগে—

সরলা গিয়ে ডাকতেই গব্বর সিং দু'খানা দিব্যি ছটফট করে ডক্টর মায়া পালিতের চেম্বারে এসে ঢুকলো।

এ সময়ে এসেছেন কেন? এখুনি আমি শুধু ফিমেল পেশেণ্ট আর শিশুদের দেখি—

জানি।

তবু এ সময় এসেছেন?

মায়ার উঁচু করে তোলা মুখে চশমার ওপিঠে চোখের মণি দুটো ঘষা কাচের নিচে গলে যাচ্ছিল রাগে—তাই তো মনে হলো তার। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, আমি তো পেশেণ্ট নই। আমি তো শুধু দেখা করতে এসেছি। ভিজিটরদের জন্যে তো এখন কোনো নিয়মবালাই নেই।

আমি এ সময় পেশেণ্ট ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করি না। আর সে পেশেণ্ট হবে ফিমেল। নয়তো বেবি। আপনি—

আমায় আপনি আপনি করছো কেন মায়া? আমি আর তুমি একসঙ্গে পড়তাম।

সেসব কথা মনে করার কোনো দরকার নেই। আপনি বেরিয়ে যান। যান—যান বলছি—

একজোড়া গব্বর সিং পিছিয়ে চেম্বার থেকে বেরোলো। তারপর উঠোন বাগান পেরিয়ে ফটাফট শব্দ তুলে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

ছিটেবেড়ার দেওয়ালের আড়াল থেকে কিছু কিছু শান্তি পালিতের কানে যাচ্ছিল। সে বেরিয়ে এলো ছুটে। এসে দেখল—কাঠের গেট খুলে সাদা পাঞ্জাবি গায়ে ছোকরা মতো কে একজন বেরিয়ে যাচ্ছে। মাথায় গাদাগুচ্ছের একরাশ চুল। তেল পড়ে না কতদিন।

শান্তি পালিত ছুটে মেয়ের চেম্বারে ঢুকলো। কাকে তাড়ালি অমন করে?

ডক্টর পালিত তখন দু'হাত মেলে দিয়ে মাথাটা টেবিলে চেপে ধরে পড়ে ছিল। ফাঁকা চেম্বার।

তুমি? তুমি এসময়ে চেম্বারে কেন মা?

রাগে তো কোনো দিগ্বিদিক ঠিক থাকে না তোমার। আমি তোমার মা। কাকে তাড়ালে অমন করে?

তোমার খুব চেনা মানুষ মা! তোমাদের জীবন ঠাকুরপোর ছেলে—বড় ছেলে!!

ওমা? কাকে তাড়ালি? কেন? কেন তাড়ালি? চিনু কি করেছে এমন?

এখন যাও মা। আমি এখন রুগী দেখবো।

এই খামারবাড়ি যখন তৈরি হয়—তখন কেউ ভাবেওনি—একদিন এখানে ইলেকট্রিক আসবে। আসবে দশঘড়ার মোটর। দুই থেকে তিন ফসলী হবে জমি—

লম্বা টানা ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা জুড়ে পদ্মা ধানের গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গর্ভথোড় ফুলে ঢোল। কার্তিকের শেষ। এখন আরেকবার নিড়েন দিয়ে ইউরিয়া খাওয়াতে হবে। খালে ধরে রাখা বর্ষার জল টানছে

ইলেকট্রিক মোটর। সে জল সিধে করে টানা নালা দিয়ে এক এক চৌকো জমিতে গিয়ে পড়ছে। আর অমনি গাভিন ধানচারা সে জল শুষে নেবার জন্যে সবুজ আর ফোলা ফোলা হয়ে পড়ছে।

বেলা তিনটের পড়ন্ত রোদে ঘোড়ার পিঠে বসা জীবনলালের কালো ছায়াটা কালচে সবুজ ধানচারার মাথায় মাথায় মিশে যাচ্ছিলো। ঘোড়া হাঁটছিল। আর তার পাশাপাশি হাঁটছিল অচিন্ত্য চট্টরাজ। ঘোড়ার পিঠ সমান সমান তার মাথা।

বাবা ভাবেনওনি—কোনোদিন এখানে এমন ফলানো যাবে। সামনে ভোট। তুমি তাতে আমায় কোনো সাহায্য করবে না—ঠিক আছে। কিন্তু এ জমিজায়গা তো দেখতে পারো।

ঘোড়ার ওপর দিকে নিজের বাবার মুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো অচিন্ত্য। আমি জমিজায়গার কি বুঝি বাবা?

এভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যেও না। তুমি আমার বড় ছেলে অচিন্ত্য। ভোটের এত বড় খরচ। চাষের খরচ। সংসার খরচা। তুমি পাশে না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে—

ভোটের খরচা খরচ করেও তোমার হাতে টাকা থাকার কথা।

যা বোঝো না—তা নিয়ে কথা বল কেন?

তোমার পার্টির স্টেট ট্রেজারার তুমিই বাবা।

কী ইংগিত করতে চাইছো চিনু?

আমি কিছুই বলতে চাই না বাবা। তবে নিজেও তো একটা পার্টির ইলেকশন ফাণ্ড নাড়াচাড়া করেছি আর তোমার পার্টির স্টেট ফাণ্ড তোমার কথায়—তোমার আঙুল নাড়াচাড়াতেই খরচ হয় বাবা।

তুমি কি বলতে চাও অচিন্ত্য?

থামিয়ে দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে বসে জীবনলাল নিচে নিজের ছেলের মুখে তাকালো।

আমি কিছুই বলতে চাই না।

জীবনলাল পড়ন্ত রোদের ভেতর ছেলের চোখের দিকে তাকাতে চাইছিল। সেখানে চোখের খোদলই শুধু দেখতে পেল। তবু ঝুঁকে পড়ে ছেলের মুখে তার চোখের উজ্জ্বল মণি দুটো খুঁজলো জীবনলাল। ইদানীং তার মনে হয়—অচিন্ত্য নামে তার এই চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলেটি কেমন যেন বিবর্ণ চুপচাপ। ওর চোখের অথৈ উদাস ভাবটা কিছুতেই ধরে

উঠতে পারে না জীবনলাল। এই না-পারা বাবার মন নিজেকে কেমন যেন পরাস্ত ভাবে।

নিজের বাবার আমলে জীবনলাল চট্টরাজ খামারবাড়ির এই জমিকে এ অবস্থায় পায়নি। সরকার দামোদর শাসন করলো। পাগলা ঘোড়ার কাঁধে জিন উঠলো। ধানের দাম বাড়লো। জমি দোফসলা তেফসলা হয়ে উঠলো। জীবনলালও ধাপে ধাপে এ জায়গাকে সেই মাত্রায় তুলে আনলো। হাজার কাজের ভেতরেও সে জমিজায়গা থেকে চোখ সরিয়ে রাখেনি।

ঘোড়া লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলছিল। তার পিঠে বসে দুই উরুতে—দুই হাতে জীবনলাল প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলার শক্তি লাগাম টেনে আটকে রাখছিল—আর তার মনে হচ্ছিলো—আমি তো লোকসভায় যাবই—সারা-দিনে একবার মায়াকে আমি পাঁজাকোলে তুলে ওর মুখখানা আমার মুখের কাছে আনতে পারি—আমার পার্টির স্টেট ইলেকশন ফাণ্ড আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু—

কিন্তু আমারই বংশধর এই যে চিনু অমন ল্যাকপ্যাক করে জমির গা দিয়ে আমার ঘোড়ার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে—আমি চোখ বুজলে ওকি সারাটা জীবন-চটি একবারও আগাগোড়া চুনকাম করাতে পারবে? ওর দু'জন মাকে ভাইবোন সমেত পেটেভাতে রাখতে পারবে? আমার রক্ত শরীরে নিয়ে ঘোরে অথচ এত দুবলা কেন?

তোমার রাজনীতিটাই ভুল চিনু—

ঘোড়ার পিঠে বসে ওসব কথা হয় না বাবা।

কেন?

এই যে ঘোড়ার পিঠে বসে জমিজায়গা দেখতে পারছো বাবা—তাও সেই আমাদের বড় পার্টির কল্যাণে!

বল বুড়ো পার্টির কল্যাণে!!

যাই বল বাবা—এই বুড়ো পার্টির ফরেন পলিসি তোমাদের সব গুঁড়ো পার্টিই ফলো করে। আর ডোমেস্টিক পলিসি—সে তো ডোমেস্টিক এয়ার-পোর্টের মতোই—তোমাদের সবারই—সে লাল সাদা হলুদ—সবারই প্লেন সেখান দিয়েই ওঠে নামে!

জীবনলাল কোনো জবাব দিল না। ঘোড়াকে সে মাপা পায়ে হাঁটতে দিচ্ছিলো। যে পার্টি চিনুদের নোমিনেশনের বেবাক বাতিল করে দেয় সে পার্টিকে চিনুর এত বিশ্বাস কেন তা খুঁজে পায় না জীবনলাল।

তোমাদের একটি ক্যাণ্ডিডেটও হাই কমাণ্ড মেনে নেয়নি চিনু—

আমার পার্টির কথা ছেড়ে দাও বাবা। সামনে তোমার ভোট। তোমাকে অনেক পথ ভাঙতে হবে।

ছেলের এ কথায় জীবনলাল যেন ভোটে জেতার কঠিন পথটার আগা-গোড়া দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে তখনি তার ইলেকশন অফিসে ফিরে যাবার জন্যে মনটা আনচান করে উঠলো। অথচ এদিকে ডাটো হয়ে ওঠা ধানচারার মাঠে সময়মত জল, সার, ওষুধ দেওয়া দরকার। তার একবার মনে হলো—আমার পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। কেউ আমার মতো করে ভাবে না। ভাবলে—সারা দেশে সঠিক লোকরাই এম. এল. এ—এম. পি হতো। সারা দেশের মাঠ সবুজ হয়ে উঠতো।

নিজের ছেলেকেই বোঝাতে পারছি না তো অন্য লোককে কি বোঝাবো! যে ছেলে কোলে উঠে একটা বয়সে চাঁদ দেখে আয় আয় বলতো—এখন সেই ছেলেই যেন আমার কেউ নয়। আমিও ওর জগতের আর কেউ নই।

বুঝলে চিনু এই মাঠখানা চট্টরাজবাড়ির সম্বচ্ছরের খোরাকি ধান জোগায়। অসুখবিসুখ, জামাকাপড়, তোমার কলকাতার মেস খরচা, নিত্যিদিনের বাজার কেনাকাটা এ মাঠের ধান বেচেই হয়।

তাহলে তো যত্ন নিতে হয় বাবা। অনেকটা আমার মায়ের মতো।

দু'হাতে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো জীবনলাল। বলে কি ছেলেটা? আজ কি শুধু অপমানই করে যাবে আমাকে? মুখে বলল জীবনলাল, তোমার মা আমাদের বাড়িতে যথাযোগ্য আসনেই আছেন।

অচিন্ত্য কোনো জবাব দিল না। ঘোড়ার ওপর তার বাবার উঁচু শরীরটার ছায়া মাঠে কাৎ হয়ে লম্বা করে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবাকে তার ছোটবেলা থেকেই অচিন্ত্য সিংহের ডুপ্লিকেট হিসেবে ভেবে এসেছে। উদার, শক্তিশালী, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংসার করা লোক। যতই বয়স বাড়ছে তার—ততই আর জীবনলালকে সিংহ বলে মনে হচ্ছে না অচিন্ত্যর। মনের ভিতর সিংহের সেই ছবিটা যতই ফিকে হয়ে আসছে—ততই ভেতর থেকে কী একটা কষ্ট উঠে আসছে অচিন্ত্যের।

কার্তিকের বিকেলে প্রতিটি ঘাসের গোড়ায় অন্ধকার এসে জমা হচ্ছিলো। দূরে জেলা শহরে রতন টকিজের নুন শো ভাঙলো। কেননা, গানের মাইক এদিক করে দেওয়ায় বাজনা ভেসে আসছে। কালীগঙ্গার গা দিয়ে গড়ে ওঠা এই খেতখামারী এলাকার নাম ডাকঘরে—সুলতানগঞ্জ। কোন এক সময়—

পাঠান কি সুলতানী আমলে ফৌজি লস্কর বসিয়েছিল সুলতানরা। তারা আর নেই। তাদের প্রজারাও বাঙালী হয়ে গেছে কবে। তবে চাষবাসে চলা-ফেরায় সেই লস্করীচাল রয়ে গেছে ঘোড়ার ব্যবহারে।

কালীগঙ্গার বুকে জল বলতে একটি ক্ষীণ ধারা। পাড় ঘেঁষে গৈবিনাথের মন্দিরের মাথায় গৈরিক ধ্বজা পতপত করে উড়ছিল। অচিন্ত্য হঠাৎ মুখ তুলে তার বাবার দিকে তাকালো। তারপর বলল, আমার মা কি তাঁর যথাযোগ্য আসনে আছেন?

কেন?

তুমিই বল বাবা! আমার বোন হবার সময় মায়ের ঘরকন্না দেখতে মাসী এসেছিল। বুলুও জন্মালো—অমনি ছোটমাসী হয়ে গেল—ছোট মা—তখন আমি স্কুলের গোড়ার দিকে।

এসব নিয়ে চিনু, কোনো বাবা তার ছেলের সঙ্গে তকরার করে না।

আমিও করতে চাই না বাবা। কলকাতা থেকে ফিরে দেখছি—মায়ের শরীর আরও খারাপ হয়েছে। গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বেড়েছে বই কমেনি।

যোগ্য পুত্র তুমি! পারলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা কর!!—বলতে বলতে হিন্দি ছায়াছবির কোন ঠাকুর মঙ্গল সিংয়ের কায়দায় জীবনলাল ঘোড়ার মুখ ফেরালো। দুই গোড়ালিতে ঘোড়ার পেটে ঠোক্কর মেরে স্পীডে সদর রাস্তার দিকে ছুটে গেল। সুলতানগঞ্জের দিকে তাকাতে তাকাতে ছোট রেলের গাড়ি তখন বুলবুলচণ্ডী থেকে শহরমুখো ফিরছে।

অচিন্ত্য দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘোড়ার পিঠে জীবনলাল আবছা হয়ে আসছে। আর খানিক পরেই ঝুপ করে সন্ধ্যা নামবে। ভাতের জন্যে মাঠভর্তি মানুষের ঘাম, অঙ্কুরের অধ্যবসায় একটু পরেই অন্ধকারে মুছে যাবে। তার চোখ দিয়ে একটি চিরকালের মানুষকে এই ছবি দেখালো সময়। ক'দিন আগে মায়া তাকে চেম্বার থেকে বের করে দিয়েছে। এখন তার বাবা শক্তিতে—ভোগ করতে পারার সামর্থ্যে ভরপুর একজন মানুষ। তাই মায়ের কথা বলতেই বাবা অবহেলায় ঘোড়া দাবড়ে বেরিয়ে গেল—পাছে দায়দায়িত্বের তাপ লাগে গায়ে। যাবার সময় অচিন্ত্যর দিকে প্রতিপক্ষের মতোই তাচ্ছিল্যের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে গেল জীবনলাল। যদিও সে ভাল করেই জানে—কেন মায়ের চিকিৎসা করার মতো কোনো আয়ই অচিন্ত্য করে না। সারাটা বিকেল অসহ্য ব্যথায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধানক্ষেতের ওপর ঝরে পড়তে লাগলো।

অন্ধকার যতই গাঢ় হচ্ছিলো—ততই ধানক্ষেতের মাঝামাঝি একটা জায়গা

আলোয় জলজল করে উঠছিল। চারদিকের সবুজ ধানচারা রাতের সেই আলোয় কালচে চেহারা এখন।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতেই অচিন্ত্য আল ধরে ধরে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। গিয়ে তো সে অবাক। এ কি কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড? কি হচ্ছে? এই ফেলু—

ফেলু নামে বড়সড় খালি গা—আধপাগলা মানুষটা—গামছাটা আঁটো করে পরে ধানক্ষেতের মাঝে ডোবায় লাফিয়ে লাফিয়ে—পাঁক মেখে মাছ ধরছে। তার মাথার ওপর মাঝডোবায় বাঁশ গেঁথে তাতে একটা হাই পাওয়ারের ডুম ঝোলানো। এদিকটায় ধানের পোকা টেনে আনার জন্যে এভাবে রাতে আলো ঝোলানো হয়।

কি হচ্ছে ফেলু? উঠে এসো। শেষে জ্বর বাধাবে—

ফেলু শোনার পাত্র নয়। প্রায় চল্লিশের খালি গা স্বাস্থ্যবান মানুষটা কোনো উলঙ্গ জন্তুর মতোই নিঃশব্দে পাঁকে পা গুজে দাঁড়ানো। ওপরের আলো থেকে ঠিকরে পড়া পোকা জলে পড়তেই মাছ হাঁ করে সেটা খেতে যাচ্ছে—আর ফেলু শিকারী জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এক কেজি দেড় কেজির কাতলাটা ধরেই ডাঙায় ছুঁড়ে দিচ্ছে—পাছে হাত ফসকে জলে গিয়ে পড়ে। মৃগেলও আছে। ভিজে হাত কেটে ফেলুর আঙুলগুলো রক্তে লাল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জমির মাহিন্দররা ফেলুকে এ অবস্থায় তাতাচ্ছে। অচিন্ত্যর মনে হচ্ছিলো—কোনো নির্লোম বনমানুষ জলে দাপাচ্ছে।

উঠে আয় বলছি। এলি—

ভিজে ফেলু কোমর জলে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো। যাবো নি। কি করবে!

অচিন্ত্য দেখলো—ফেলুর সারা গায়ে ধানক্ষেতের বিষাক্ত পোকাগুলো এসে বসছে। আবছা আলোয় মনে হবে—ফেলুর সারা গায়ে বুঝি বা দাগড়া দাগড়া কিছু বেরিয়েছে।

অচিন্ত্য আর থাকতে পারলো না। এক ধমকে মাহিন্দরদের থামালো। তারপর নিজেই হড়হড় করে জলে নেমে গেল। ডোবার কোনো পাড় নেই। ধানে ওষুধ দিয়ে স্প্রেয়ার ধোয়া হয় ওখানে নিশ্চয়। সারের বস্তাও ধোয়া পড়ে। জলে নামতেই তার সারা গা চিড়বিড় করে উঠলো। এই ফেলু—ওঠ বলছি—

জলে আরেকজনকে পেয়ে জড়বুদ্ধি ফেলু অচিন্ত্যর দিকে জল ছেটাতে

লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মাহিন্দররা চেঁচিয়ে উঠলো। একজন মাহিন্দর তো পাড়ে দাঁড়িয়েই লম্বা বাঁশ বিয়ে ফেলুর মাথাটা লক্ষ্য করে ডগাটা তাগ্ করতে লাগল। হাজার হোক অচিন্ত্য তো বাবুর ব্যাটা। তার গায়ে জল ছেটানো। মজা বুঝতে হবে না!

কোমর জলে দাঁড়িয়েই অচিন্ত্য সেই মাহিন্দরকে ধমকালো। তারপর গলা নরম করে বলল, ও ফেলুদা—শুধু শুধু কেন জল চাপড়াচ্ছ? ওঠো—

তাহলে মাছ ধরবে কে? মাছ ধরবে কে শুনি?

একদম বালকের যুক্তি দিয়ে ফেলু কথা বলে যাচ্ছিলো। এখানে মাছটা প্রধান নয়—ধরাটাই প্রধান।

অচিন্ত্য শান্ত গলায় বলল, এই সন্ধ্যে রাতে কে মাছ কুটবে—কে-ই বা রাঁধবে বল?

আলো যেদিকটায় বেশি ঝাঁঝালো হয়ে পড়েছে—সেখান থেকে একটা গলা ভেসে এল, আমি রাঁধবো। আমি কুটে নেব। তোমরা উঠে এস। উঠে আয় বলছি ফেলু—

ফেলু সুড় সুড় করে উঠে গেল। পেছন পেছন অচিন্ত্য। ফেলুর মা যে কখন এখানে এসে হাজির হয়েছে কেউ জানে না। এক মাথা সাদা চুল, সরু পাড়ের ময়লা শাড়ি—দেখলেই মনে হবে বুঝি না কোনো মূর্তি। ধুলো পড়ে আছে।

খানিক অন্ধকার—খানিক আলো পেরিয়ে ফেলু আর ফেলুর মায়ের পেছন পেছন অচিন্ত্য এসে খামারবাড়ির লাগোয়া ইট পাতা ধানঝাড়াই চাতালে এসে পৌঁছালো।

তোমরা এখানে বস। আমি মাছ তৈরি করে দিচ্ছি।

ফেলু খালি গায়ে ভিজে অবস্থায় চাতালে বসে পড়ে বলল, হ্যাঁ, মা মাছ পোড়াও। আমি লঙ্কা তুলে আনি।

এ অভিজ্ঞতা অচিন্ত্যর ছিল না। একে একে মাহিন্দররাও এসে জুটছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে চাতাল। ফেলুর মা যোগাড়যন্ত্র করতে করতেই বলল, তোমার আগে কেউ কখনো ফেলুর জন্যে এতটা চিন্তা করেনি—

অচিন্ত্য অবাক হলো—ফেলুর মায়ের কথাবার্তায়। রীতিমত গোছানো বাংলা।

ফেলুর মা তিনটে কাতলার আঁশ তুলতে তুলতে বলল, তুমি ওকে দাদার মতো জল থেকে তুললে—ফেলুটা একেবারে অবুঝ!

কোথায়! ও তো উঠলো তোমার কথায়।

তুমিই তো বাবা ওকে উঠতে বলছিলে। ফেলুটা আমার বোকা হয়েই জন্মায়। মাহিন্দররাই কাঠ জেলে আগুন করলো। তারপর আঁশ ছাড়ানো, পিত্তি গালা মাছ তিনটে তারের আঙটায় আগুনের ওপর ঝলসাতে দিল তারাই। ফেলুর মা মাছ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলো আগুনে। এমন সময় এক কাড়ি লঙ্কা নিয়ে ফিরে এলো ভিজে গা ফেলু। তখনো টপটপ করে জল পড়ছে তার মাথা থেকে।

কোত্থেকে এ লঙ্কা আনলি? ও ফেলু? এ যে বাবুর হিসেব করা বস্তা থেকে এনেছিস—

ফেলু তাতে ঘাবড়ালো না। হয়েছে কি মা তাতে? বাবু বুঝতে পারবে না।

খুব পারবে। রেখে আয় বাবা। ফাগুন মাসে এ লঙ্কা জীবনচ-টিতে যাবে।

এবার অচিন্ত্য ধমকে উঠলো। হোক না খরচা—হয়েছে কি তাতে?

না বাবা। রেখে আয়।

ফেলু রেখে আসতে রাজী হয় না কিছুতেই। এদিকে মাছ পুড়ে যাচ্ছে। লঙ্কা পুড়িয়ে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে মাছ মাখতে হবে। কাঁটা ছাড়াতে হবে। অচিন্ত্যরও খিদে পেয়েছে। অগত্যা সে-ই উঠলো।

ইটের চাতালের গায়েই ব্যারাক বাড়ি মতো। চ্যাটাইয়ের দেওয়াল। ওপরে টালি। লম্বা আটচালার এককোণে চায়ের সরঞ্জাম। পাম্পসেট গোটা কয়েক। স্প্রেয়ার চারটে। আর থাক থাক সারের বস্তা। একপাশে খালি বস্তার গাদি। তার পাশেই কাঠের পাটাতনে বস্তার গাদি। ধরে রাখা ধান। লঙ্কার বস্তা থেকে লঙ্কা ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। তারপরেই বাঁশের মাচানে কানি কাঁথার বিছানা। বাঁশের আলনায় সাত পুরনো শাড়ি। ফেলুর গায়ে দেবার একটা আলখাল্লা মার্কা টাউস শার্ট ঝুলছে। সারা আটচালায় শুধু একটা ডিম আলো খুব উঁচুতে।

লঙ্কা রাখতে গিয়ে দেওয়ালে চোখ পড়লো অচিন্ত্যর। আরে! এ ছবি তো তার চেনা। জীবন-চটির বৈঠকখানার দেওয়ালে এরই একখানা ডুপ্লিকেট আছে। মেজর জে. চট্টরাজ। ফৌজি উর্দির ভেতর থেকে সদ্য গোঁফ ওঠা একখানা হাসি হাসি মুখ ফুটে উঠেছে।

অগোছালো—বাছাই হয়নি লঙ্কা পড়ে ছিল ওজনের বড় কাঁটার পাল্লায়।

তাই তুলে নিয়ে ফিরে এল অচিন্ত্য। ও ছবি কার?

পাকা হাতে কাঁটা বাছতে বাছতে ফেলুর মা বলল, মেজর চট্টরাজের।

খাবার আহ্লাদে একদম উদোম বনমানুষের মতো উদগ্রীব হয়ে পা নাচাচ্ছিল ফেলু—সে একগাল হেসে বলল, মা বলে—ওটা নাকি আমার বাবা! সত্যি মা?

ফেলুর মা কোনো জবাব দিল না। যেমন কাঁটা ছাড়াচ্ছিল—তেমনই ছাড়াতে লাগলো। শুধু মাহিন্দরদের একজন আগুনে একটা কাঠ উল্কে দিয়ে মাথা নিচু করলো।

তখন ফেলুর মা বলল, খুব সাহসী ছিল তো।

কাঠের আগুন সারাটা অন্ধকারের ভেতর ফেলুর মায়ের মুখে লকলকে ছায়া ফেললো।

তখন ফেলুর দিকে তাকিয়ে তার মা বলল, তার খাস—পরিস। তা বাবার মতোই তো।

মাথা নিচু করে বসা বুড়ো মতো সেই মাহিন্দর বলল, সাহসী বলে সাহসী। ঘোড়ার পিঠে বসে ডাক ডাকাতি করেছিল—তখন লালমুখোদের আমল। জজ পুলিশ—সবাই তখন গোরা।

নাও। খাও বাবা।

সবার সঙ্গে আলো আঁধারিতে বসে কাঁচা শালপাতায় মাছ পোড়া খেতে অচিন্ত্যর অমৃত লাগলো। একদম অমৃত।

স্বাধীনতার পরেও দু'এক বছর জীবনলালকে অনেকে মেজর চট্টরাজ বলতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর শহরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেজর চট্টরাজ অনেক প্যারেড করেছে। বড় পার্টি থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর জীবনলালদের পতাকাও পালটে যায়। স্বাধীনতার পর লোহিয়া, জয়প্রকাশ—অনেকেই বড় পার্টি থেকে বেরিয়ে এলেন। জীবনলালরা তাদের পার্টির নামের আগে বিপ্লবী আর সমাজতান্ত্রিক কথা দু'টি বসিয়ে নিল।

এসব পার্টির অ্যানুয়াল কনফারেন্স সাধারণত মধ্যভারতেই হতো। অমিয় মারা যাবার পর সেবারে কনফারেন্স হলো বোম্বেইয়ে। স্টেট থেকে অন্তত জনা তিরিশ ডেলিগেট যাওয়া দরকার। তাই সবে ডাক্তার হয়ে বসা মায়াকে অনেক বুঝিয়ে তবে বম্বে কনফারেন্সে নিয়ে চললো জীবনলাল। ট্রেনেও

জীবনলাল বন্ধুর মেয়েকে যেমন তুই তুই বলে ডাকা হয়—সেইভাবেই ডাকছিল—কথা বলছিল। কিন্তু পরদিন বিকেলে ট্রেন নাগপুরে ঢুকতেই কি হলো জীবনলালের—সে তুমি বলে ডাকতে লাগল মায়াকে।

মায়া তার মায়ের কাছে এই জীবনলালের কথা অনেকে শুনেছে। নিজে ও ছোটবেলায় বাবার কাছে আসতে দেখেছে মানুষটাকে। তখন তো টগবগে ঘোড়ার মতো জীবনলাল তাদের বাড়ি আসতো। হাসিতে কথায় মাতিয়ে দিয়ে চলে যেতো।

ভোটার লিস্টের টাইপ কপি সামনে রেখে এই সব সাত পাঁচ ছবি নিজের মনের ভেতর দেখতে পাচ্ছিল মায়া পালিত এম. বি. বি. এস।

সেবারে পার্টি কনফারেন্স হয়েছিল বোম্বাইয়ের সায়ন এলাকায়। সম্মুখম হলে সারাদিন ধরে মিটিং। রাতে দোতলার করিডরে পাত পেতে খাওয়া। শোওয়া সেই তেতলার করিডরে। মেয়ে ডেলিগেটদের জন্যে আলাদা জায়গা।

নিশুতি রাতে সিঙ্গল মশারির ভেতর মায়ার ঘুম ভেঙে গেল। কালীপুজোর আগে বাতাস ঠাণ্ডা। চাদর তুলে বিরাট একটা চিতার মতো হামা দিয়ে—আশপাশের মশারির ভেতরকার মহিলা ডেলিগেটরা যাতে টের না পায় এইভাবে—জোছনা এসে পড়া সামান্য আলোয় জীবনলাল হাতজোড় করে চুপ করিয়ে দিয়ে তাকে ঠোঁট দিয়ে—হাত দিয়ে—গলা দিয়ে—মাথা দিয়ে বুকে পিষে ফেলে।

মায়ার চেঁচাবার উপায় ছিল না। কেননা, পার্টি মহলে জীবনলাল ভয়ঙ্কর উঁচুর একটা নাম। চেঁচালে যে কেলেঙ্কারি হতে পারে—তাকে কেলেঙ্কারি না ভেবে মায়ার মনে হয়েছিল বিপর্যয় বা ভূমিকম্প ভাবাই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে সে ভালোভাবে এই প্রথম টের পাচ্ছিলো – পুরুষ মানুষ কী এবং কেমন।

তারপর জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ার মতো জীবনলাল এই কিছুকাল ইচ্ছে মতো তার জীবনে এসে পড়ে—আবার চলেও যায়—ফিরে আবার আসবে বলে—কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের তফাতে আবার আসে তার দখল নিতে।

ইদানিং পলিটিকস্, ভোট, পার্টি—সবকিছু ছাড়িয়ে তার জন্যে জীবনলালের ক্ষ্যাপামি দেখে মায়া ভয় পায়—আবার তার আনন্দও হয়। ডাক্তারি, বসতবাড়ি, মা, পিতৃপরিচয়, ভোট—সবকিছুর জন্যে একজন দামাল লোক তার জন্যে অস্থির হয়ে পা দাপাচ্ছে—এটা দেখে বুঝে মায়ার শরীর মন জুড়ে কী এক ক্ষ্যাপা আনন্দ হয়।

টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভার ধরলো মায়া।

গাড়ি পাঠিয়েছি। এখুনি চলে এস। বেলা তিনটেয় সেহেরাবাজারে মিটিং। আসার সময় দুটো ফেস্টুন আনতে ভুলো না মায়া—

জবাবের অপেক্ষা না রেখে ওপাশে ফোন নামিয়ে দিল জীবনলাল। সেহারাবাজার অক্ষয়কালীর মোড় থেকে বারো কিলোমিটার। হাতঘড়িতে বেলা পৌনে দুটো। জানলা দিয়ে মায়া দেখতে পেল—পার্টির হলুদ রঙের জিপটা কালীগঙ্গার ওখানে ধুলো উড়িয়ে মোড় নিচ্ছে।

ড্রয়ার থেকে চিরুনি বের করে মায়া তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে নিতে লাগলো।

ঠিক এই সময় অচিন্ত্য চট্টরাজ সদর শহরের বাড়িগুলোর গায়ে সব দলের পোস্টার আর স্লোগান পড়তে পড়তে এগোচ্ছিল। বেশির ভাগ দেওয়াল-লিখন।

লং লিভ জীবনলাল
আপনাদের সেবায় ভোটপ্রার্থী
বিপ্লবী সমাজবাদী
জীবনলাল চট্টরাজ

কোথাও বা লেখা—

বিধানসভায় মায়া পালিত
লোকসভায় জীবনলাল
একটি ভোট একটি তড়িৎ
করবে কামাল সবই কামাল

কোনো কাঁচা কবির কাঁচা কবিতা। দেওয়াল লিখিয়েদের জন্যে সাত তাড়াতাড়িতে লেখা। অচিন্ত্যর গালে এখন কাঁচা দাড়ির দাম। কালো ভারি ভ্রূর নিচে সব সময় একজোড়া কালো চোখ চকচক করে। তার নিজের পার্টির যেসব লোক এখান থেকে নমিনেশন পেয়েছে—তারা অচিন্ত্যর মতো প্রাদেশিক ছাত্র নেতাকে ডরায়। কাজের ভার নিয়ে পাছে সাবোতাজ করে দেয় ভোটে।

সারা শহর—তার আশপাশের গাঁ-গঞ্জ ভোটের জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। শুধু সে-ই এই ডামা-ডোলে একরকম নিষ্কর্ম হয়ে বসে। সে কারও ভেতরের লোক হতে পারলো না। পারলো না কারও কনফিডেন্সে আসতে।

ডিগ্রি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো অচিন্ত্য। কেমিস্ট্রি ল্যাবোরটরীর

জানলা খোলা। বি. এ, বি. এস-সি ফাইনাল সামনে যাদের—তাদের প্রিটেস্ট সামনে। বারো ক্লাস বোধহয় এখন ছুটি।

ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারের ওই চওড়া সিঁড়ির মুখে মায়া তাকে ডেকেছিল। শুনুন—

কো-এডুকেশন কলেজ। তাছাড়া ইউনিয়ন করা অচিন্ত্যর তখনও না ছিল কোনো জড়তা – না আছে এখনো কোনো মিছিমিছি লজ্জা। অচিন্ত্য ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বলুন।

আপনার বাবা তো জীবনলাল—

হুঁ। আপনি অমিয় পালিতের মেয়ে।

হ্যাঁ। আমি বলছিলাম—আপনাদের আন্দোলনে শুধু শুধু ফিজিক্সের দুটো ক্লাস হলো না। কেমিস্ট্রিও একদিন বন্ধ গেল।

ক্লাস করার জন্যে কি সরকারের অন্যায় স্কুল কোড্ বিল মেনে নিতে বলেন?

বারো ক্লাশের সদ্য শাড়ি ধরা মায়া বলেছিল, সেজন্যে তো বিধানসভা আছে—আছে জনসভা। আমাদের ক্লাসগুলো এজিটেশনের সামিল না করে—অন্য কোনো পথে যাওয়া যায় না?

চমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অচিন্ত্য। বলে কি অমিয়কাকুর পুঁচকে মেয়েটা!

এই করেই শুরু। তারপর গরুর গাড়ির চাকা বহু হাজার বার ক্যাঁচ-কোঁচ করে শব্দ তুলে ভাতওয়ালা বাড়ির ধান এনেছে শহরে—মাঠ থেকে। অক্ষয়কালীর মোড়ের মাথায় সন্ধ্যে হলে চাঁদ নেমে এসেছে এই জেলা শহরকে চিনে নিতে। দুনিয়াটাই ওলোটপালোট হয়ে গেছে এই বারো তেরো বছরে।

ও চিনুবাবু—শোন শোন। এমন দাড়ি করেছ গালে—আমি তো চিনতেই পারিনি গোড়ায়—

দুপুরের দিকের শহর বাজার কিছু খা খা করে। কোত্থেকে তাকে ডাকছে? এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল—লোহার গরাদের ওপাশে বসা মতি স্যাকরার হাসিহাসি মুখ—কাঁচা পাকা গোঁফ—চোখে সোনা গালানোর চশমা।

গরাদের বাইরে টুলে গিয়ে বসলো অচিন্ত্য। অন্য কেউ তো দাড়ি মুখে চিনতেই পারে না আমাকে।

এ পথ দিয়ে স্কুলে যখন যেতে তখন থেকেই তোমায় চিনি যে চিনুবাবু?

খবর কি?

খবর আর কি! হ্যাঁ—একটা আছে বটে। তোমার কি কাজে লাগবে? বুঝতে পারছি না।

বলুন না মতিদা।

জীবনলাল আবার বালার অর্ডার দিয়েছেন। একজোড়া!

আবার? একজোড়া?

তা নাহলে তোমায় ডাকবো কেন! মাল রেডি হয়ে পড়েছিল। এই তো দুদিন হলো নিয়ে গেলেন। ও কি? উঠছো কেন?

সেবারে কনফারেন্সের শেষে জীবনলাল ফিরতি পথে মায়াকে নিয়ে নাসিকে নেমে পড়েছিল। পার্টির অল ইণ্ডিয়া ট্রেজারার ব্যাসদেও কেরকর নাসিকের মানুষ। এইসব লোকের সঙ্গে মিশে আরাম পায় জীবনলাল। টাকা, ক্ষমতা. শিল্পপতি, অন্যদলের মাথাদের সঙ্গে এসব লোকের বাড়িতে মাখামাখি হয়। ব্যাসদেও বিদর্ভ এলাকা থেকে দু'বার মন্ত্রী হয়েছে আগে। রাস্তায় বেরোলেই লোকে তাকে কেরকর সাহাব বলে।

শহরের বাইরেই লোকটা একটা দুর্গমতো বাড়িতে থাকে। পাথরের বারান্দা। তার নিচেই কালো আঙুরের ক্ষেত। দূরে পাহাড়ের জলছবি। তার পায়ে একটা পাথুরে নদী।

বাবাসাহেব বাসুদেব কেরকর রাজ্যসভায় দলের নেতা। পাবলিক আকাউন্টস কমিটির মেম্বার। সেই সুবাদে সারা দেশ ঘুরে বেড়ান। সরকারি কারখানাগুলোর সর্বত্র ফুটো। তারা বাবাসাহেব টুরে বেরোলে তটস্থ হয়ে থাকে। গাড়ি, প্রাইভেট প্লেন, গেস্ট হাউস. খাবারদাবার সবই তাঁর জন্যে রেডি করা থাকে। লোকটাও নবাবী চালের। চলাফেরা যেন চলন্ত একখানা কালো পাথর।

জীবনলালের সঙ্গে জমে গিয়েছিল বাবাসাহেব বাসুদেবের। মায়াকে নিয়ে নাসিকে তার দুর্গে উঠেছিল জীবনলাল।

এই বাঙালীকেও মনে ধরেছিল কেরকরের।

ওর এলাকায় পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। পাথরের বারান্দায় দরবারী স্টাইলের বৈঠকখানা থেকে রেকর্ডের গান ভেসে আসছিল—

আও আও গজগামিনী

সুহাসিনী কমলবাসিনী

আও আও—

কে গায় ?

মায়ার একথায় সমঝদারী মাথা নেড়ে বাবাসাহেব বলেছিল—কুমার গন্ধর্ব। বেহাগ খাম্বাজ।

জীবনলালের মনে হচ্ছিলো—মায়া খোদ একটি রাগিনী হয়ে পাথরের বারান্দায় দাঁড়ানো।

তখনো ওরা দু'জন বাইরেটা সব দেখেনি। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে গাইগরুর তৃপ্ত ব্যা ব্যা। জাবনার গুড়ভুষির গন্ধ বাতাসে। সেই সঙ্গে গলার ঘণ্টার শব্দ।

পরদিন ভোরবেলাটা ওদের চোখের সামনে ছবির বই থেকে নেমে এসেছিল। দোতলার ঘরে বিরাট পালঙ্কে দু'জন বসে। সামনের জানলায় আবছা পাহাড়। নিচে প্রান্তর জুড়ে বড় বড় গাই—গলায় ঘণ্টা—সঙ্গে সঙ্গে মারাঠী রাখাল বালক—তাদের উষ্ণীষে পাখির রঙিন পালক।

আঙুর পেয়াই অঙ্গিরা রস খেয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল মায়া। চল ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে ?—বলেও বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল জীবনলালের।

যেখানে ইচ্ছে—

নিচে নেমে শুনলো—বাবাসাহেব অনেক ভোরে বেরিয়ে গেছেন। কোনো অসুবিধে হবে না। টাঙ্গা রেডি।

টাঙ্গায় বসে জীবনলাল ছিপটি নিজের হাতে নিয়ে চালিয়েকে নামিয়ে দিল। টাঙ্গা মুখে হরবখত্ চালানে পড়তা। এ গাড়ি সে মেরা বহুৎ দিল পয়ছানি—

মায়া তো ভয়ে ভয়ে উঠে জীবনলালের পাশে বসলো। তারপরই পাকা টাঙ্গা-চালিয়ে রেওয়াজ ছড়িয়ে গাড়ি ছুট করালো জীবনলাল।

সেদিন সারাটা সকালে জীবনলালের মনে জীবনের প্রথম যৌবনের আদি প্রভাত ফিরে এসেছিল। মায়া খুশীতে—একজন পূর্ণ নারী হয়ে ওঠার আনন্দে ঢলে ঢলে পড়ছিল। জীবনলাল হয়ে উঠছিল বাইশ চব্বিশ বছরের নবীন প্রেমিক। মায়া তার চওড়া বুকে মাথা রাখছিল—চোখ বুজে দুমদুম করে সেখানে ঘুষি বসিয়ে দিয়ে—যেন বা জীবনের ঢাক বাজাচ্ছিল। তখন জীবনলালের রক্তস্রোতে একটা সাদা ছোট্টফুল মূর্তিমান সংশয় হয়ে ভেসে যাচ্ছিলো।

ফিরতে ফিরতে নতুন শীতের দুপুর। বাবাসাহেব একা একটা বেতের চেয়ারে বসে তখন। পাইকরা দরকারী রেওয়াজে পাখির মাংস ঝলসে এনে লম্বা কালো কাঠের পাতে রাখছে। অঙ্গিরা দিয়ে গলা ভিজিয়ে সেই মাংস কামড়ে কামড়ে খাওয়া। সঙ্গে সেদ্ধ সিম। কাঠের বাটিতে খোসা-খোলা আখরোট। প্রথম যৌবনের সেই আদি প্রভাতে নাসিকের মাঠ ঘাট, পাহাড়ের জলছবি, উষ্ণীষধারী রাখালদের হাসি, তৃপ্ত গাইগরুদের ঘণ্টাধ্বনিও মিশে ছিল। কচি ধন্বন্তরী মায়াও সেদিন সকালে ছিল আগাগোড়া কমলহাসিনী।

ভোটে দাঁড়াবার পর থেকে মায়া গাড়িতে উঠলেই ড্রাইভারের পাশে বসে। যেন ওখানে বসলেই গাড়ির আগে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। পেছনের সিটে বসলে পিছিয়ে পড়তে পারে!

অক্ষয়কালীর মোড়ে কালীগঙ্গা ধরে জিপ বাঁক নিল। নদীর গায়ে ক্যাসিয়া গাছের মোটা গুঁড়ি ডালপালা মেলে দাঁড়ানো। গাছতলার সবুজ ঘাসের ডগা হলুদ ক্যাসিয়া ফুলের ঝরা পরাগে ঢাকা পড়ার যোগাড়।

ঠিক ওখানটায়।

ফার্স্ট এম. বি-র রেজাল্ট তখনো বেরোয়নি। হোস্টেল থেকে ছুটি কাটাতে এসে একদিন মায়া অচিন্ত্যর সঙ্গে এক বিকেলে ওখানটায় বসেছিল। মায়া নিজেই খবর দিয়ে অচিন্ত্যকে সেদিন ডাকিয়ে আনে। মহেন্দ্র সহিসের সঙ্গে বাজারের পথে দেখা। তাকেই বলে দিয়েছিল মায়া—কোথায় আসতে হবে—কখন আসতে হবে।

এদিকটায় ঝড় উঠলে ঝোড়ো বাতাস মাঠের পোড়া ঘাস, কাগজের টুকরো—সবই আকাশে উঠিয়ে বাতাসের ঘূর্ণী খাওয়ায়।

মায়া এসে গাছতলায় বসেছিল। বিকেলবেলার ছায়া ঘাসে। হলুদ হলুদ পরাগরেণুর ওপর কালো কালো ঘাস-পিঁপড়ে বেয়ে উঠছিল। ক'বছর আগে এ-পথে এত লোক চলতো না।

কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে এল অচিন্ত্য। কি বলবে বল? ডেকে পাঠিয়েছো কেন?

অচিন্ত্যর এ ভঙ্গীতে কান্না পেয়ে গিয়েছিল মায়ার। জীবনের প্রথম প্রেম অচিন্ত্য। কলেজ করিডর, পিকনিক, ইংরিজির ক্লাস—সর্বত্র দু'জনে চোখাচোখি হতো। একদিন তো অচিন্ত্য গাঢ় গলায় বলেছিল, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। একদিন বোধহয় অভিমানী অচিন্ত্যকে শান্ত করতেই মায়া দু'লাইন লিখে পাঠিয়েছিল—তুমি যা চাও তা বুঝি। কিন্তু এখনো

তার সময় হয়নি। সবই তোমার জন্যে—

তখন এমন হেঁয়ালী রেখেই প্রেমপত্র লেখার রেওয়াজ ছিল। এখন সেই চিঠি আর চিঠির ভাষা দুইই মনে পড়তে মায়ার হাসি এসে গেল।

তবে সবসময় যে কথা হতো তা নয়—অচিন্ত্য অদ্ভুত করে হাসতে পারতো, তাকে দেখে আনন্দের হাসি। সে হাসিতে টান টান মুখখানা অচিন্ত্যর সুন্দরই দেখাতো।

শুধু একদিন—

জেলা শহর থেকে লোকাল ট্রেনে কাছেরই বড় জংশনে যাবার সময় অচিন্ত্য এমন করেই তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল—মায়ার চোখ বুজে আসে—অচিন্ত্য নিতান্ত আনাড়ির মতোই তার ঠোঁট খুঁজছিল—মাথা দিয়ে বোকার মতো বুকে ঢুসিয়ে—শেষে তার গলায় পৌঁছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার কায়দায় সে কি চুমু খাওয়া। চোখ বোজা অবস্থায় মায়াও একবার মুখ এগিয়ে দিয়েছিল।

আমাকে দেখে একজন যে সুখের হাসি হাসছে—তা দেখে—তা বুঝতে পেরে একরকমের আনন্দ হয়। সে আনন্দে নিতান্ত সাধারণ ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাটকেও সুন্দর লাগে।

ক্যাসিয়া গাছতলা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে—নিজের কান্না চেপে মায়া সেদিন বলেছিল—তুমি পরীক্ষা দেবে না? আমি ডাক্তারি পড়ছি।

আমার অনেক কাজ পড়ে আছে মায়া। এই শহর—এই জেলা—আমাদের বড় নেতাদের ভুলে—স্বার্থপরতায় আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে আমাদের। আবার তা ফিরে পেতে হবে আমাদের। যতদিন তা না হচ্ছে—ততদিন আমার ঘুম নেই মায়া। শান্তি নেই মায়া।

গণতন্ত্রে তো হাত বদল হয়ে থাকেই চিনু। তুমিই তো বলতে—

বলতাম ঠিকই। কিন্তু ওরা ভুল বুঝিয়ে আমাদের গণতন্ত্রকেই মিথ্যে করে দিচ্ছে। গণতন্ত্রের নাম গণতন্ত্রের ভেতরেই ওরা সুড়ঙ্গ কাটছে। সবকিছু ধসিয়ে দিয়ে। দিয়ে তবে নিজেদের রাস্তা কাটবে।

কাটবে কি! কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

তাহলে তোমার পড়াশুনোর এখানেই ইতি?

হয়তো তাই মায়া। কাউকে তো এগিয়ে এসে কিছু করতে হবে। তোমার কাজ তো অন্যে করে দেবে না মায়া!

জগতের সব ভার তুমি একা মাথায় নিয়েছো চিনু!

সব কিনা জানি না। তবে এটুকু না নিলে তোমার ডাক্তার হয়ে ওঠাও একদিন বন্ধ করে দেবে ওরা। তুমি কি এইটুকুও দেখতে পাও না মায়া?

আমি দেখতে পাচ্ছি—তুমি আমি—আমরা যা ভেবেছিলাম—তা সবখানি নষ্ট হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময়টায় ঝড়টা ওঠে। হলুদ ফুলরেণু, শুকনো পাতা—সব বাতাসের সঙ্গে ঘূর্ণী খেয়ে আকাশে উঠে গেল। ফাল্গুনের লম্বা দিন ছিল। আলো ছিল অনেক। সব কেমন ধুলোর ঝড়ে আঁধির দশা পেল।

শোন মায়া—বড় কাজে সুখদুঃখ অনেক সময় তলিয়ে যায়—

মায়া আর কোনো কথা বলেনি। একা একা অমিয়নগরের পথে ধরেছিল। অচিন্ত্য খানিক রাস্তা সাইকেলে এসেছিল পেছন পেছন। মায়া ফিরে তাকায়নি। যখন তাকালো—তখন দেখেছিল—সাইকেল নেই। অচিন্ত্য নেই।

রাস্তায় বেরোলেই আজকাল 'লং লিভ' কথা ক'টি জীবনলালের চোখে বর্শার মতো খোঁচা দেয়। এই জেলা সদরের বট গাছটাও তার সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা ছড়িয়েছে। কোর্ট ময়দানের টিনের এক চালা খাবারের দোকানগুলোকেও তার আত্মীয় লাগে। আত্মীয় লাগে শুকনো কালীগঙ্গাকেও।

এক এক সময় জীবনলাল চট্টরাজের জীবন-চটির এই সংসার জীবনলালের গায়ে জ্বালা ধরায়। কেন যে নগর বসালাম। এমনই মনে হয়। না বসালে এখন ঝাড়া হাত পায়ে মায়াকে নিয়ে নতুন কোথাও গিয়ে সংসার পাতা যেতো। কারও কিছু বলার থাকতো না। থাকতো না মায়ারও কিছু বলার। দিব্যি খোলা স্লেট। কোনো দাগ নেই। মায়াকে নিয়ে নতুন চকখড়ির দাগ পড়তো সে স্লেটে।

মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে সকালবেলায় খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো জীবনলাল। একতলার বৈঠকখানায় এখন গাদাগুচ্ছের পোস্টার লেখা হচ্ছে।

লং লিভ জীবনলাল। কিংবা—

বিধানসভায় মায়া পালিত
লোকসভায় জীবনলাল
একটি ভোট একটি তড়িৎ
করবে কামাল—সবই কামাল

সবই কামাল! কথাটা মনে মনে বলে নিজে নিজেই হাসল জীবনলাল। লোকসভা কন্সটিটুয়েন্সি বিরাট এলাকা। প্রায় সাত লাখের মতো ভোটার। ভোটার লিস্টের পার্ট বাই পার্ট ধরে ভলান্টিয়ার ছড়িয়ে দিয়েও স্বস্তি নেই। এর চেয়ে টাঙ্গায় চড়ে মায়াকে নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া কত আনন্দের!

ইজিচেয়ারের সামনে চা দেবার ছোট টেবিলটায় আয়নার দিকে তাকিয়ে জীবনলাল মাথার চুল ঠিক করলো। কাঁচা পাকা ট্রিম করা দাড়ির তোয়াজ করলো। তারপর পাশেই রাখা ছোট বাক্সটা খুললো জীবনলাল। না— আশেপাশে কেউ নেই।

বিড়ে পাকিয়ে শুয়ে থাকা একজোড়া বালা চোখের সামনে তুলে ধরলো জীবনলাল। আলো পড়ে তা চিকচিক করে উঠলো। খোলা জানলার সিধে সিধে লোহার শিকের পটভূমিতে গোল বালা জোড়া আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জীবনলাল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলো দু'খানা হাত। তারা বাঁধা পড়েছে এই বালায়।

এবার কার জন্যে গড়ালে!

কে?

আমি গো আমি। লুকোচ্ছো কেন? দেখি—বলে ছোঁ মেরে বালা জোড়া জীবনলালের পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল অচিন্ত্যর মা। বাঃ! বেশ গড়িয়েছে তো মতি স্যাকরা। ডিজাইনটাও নতুন। মকরমুখো! অ্যা!! তা কোন মুখ দেখে বালার অর্ডার দিলে গো—

উঠে দাঁড়িয়ে বালা জোড়া প্রায় কেড়েই নিল জীবনলাল। তারপর নিজের স্ত্রীর শুকনো মুখ—জেগে ওঠা নাকের দু'পাশের চোখের গর্ত দেখে— মুখে এসে পড়া চোখা চোখা কথা মনে মনেই গিলতে হলো জীবনলালকে।

আহা! বলই না এবার কাকে দেখে মজলে? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। এসব না জানতে পারলে ঘুমই হবে না যে—

জীবনলাল উঠে গিয়ে দরজা পেরিয়ে করিডরে যাবে—আর অমনি তার স্ত্রী হো হো করে ভাঙা হাসিতে ভেঙে পড়ল। পড়তে পড়তেই আচমকা একদম চুপ করে গিয়ে বলল, ভোটের যা গান বেঁধেছে ওরা তাতে কান পাতা দায়—

পাছে হাড় পিত্তি জ্বালানো সেইসব গান গাইতে শুরু করে দেয় অচিন্ত্যর মা—তাই দোতলা থেকেই জীবনলাল চেঁচাতে লাগল, মহেন্দ্র—ও মহেন্দ্র— আমি বেরোবো।

খানিকবাদে দেখা গেল - শহরের বড় রাস্তার মাঝখান দিয়ে জীবনলাল ভীষণ জোরে টাঙ্গা ছুটিয়ে চলেছে। আর তার পেছন পেছন শহর থেকে বেরোবার জন্যে বাস, লরির সারি। তারা টাঙ্গার চেয়ে অনেক জোরে দৌড়তে পারে। কিন্তু জীবনলাল যে রাস্তা দেবে না। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে জীবনলাল ছিপটি চালাচ্ছে ঘোড়ার ওপর। এই অবস্থায় বাস বা লরি—কোনো গাড়িরই ড্রাইভার হর্ন দিতে পর্যন্ত সাহস পেল না।

শহর ছাড়িয়ে বাস, লরিগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। জীবনলাল বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে খামারবাড়ির পথ ধরলো। আর কিছুটা এগোলেই এই সুলতানগঞ্জের আকাশে বৈবিনাথের মন্দিরের ধ্বজা পতপত করে উড়তে দেখা যাবে।

টাঙ্গা গিয়ে বাড়ির হাতায় ঢুকতেই জীবনলাল লাফ দিয়ে নিচে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গা দাঁড়িয়ে পড়েছে। শীতল—ও শীতল

ধানঝাড়াইয়ের চাতালের লাগোয়া ব্যারাকবাড়ির ভেতরে বসে অচিন্ত্য স্প্রেয়ারের নজেল উকো দিয়ে ঘষছিল। নজেল ঠিক মতো না বসলে সমান মাত্রায় বিষ মেশানো জল গিয়ে ধান পাতায় পড়ে না। এই হপ্তা দুয়েক সে এখানে অনেক কিছু শিখেছে।

এ গলা অচিন্ত্যর চেনা। সে উঠে দাঁড়ালো। জীবনলালকে দেখতে পেল—সে ছুটতে ছুটতে ঢাকা বারান্দায় ঢুকছে। শীতল—কোথায় গেলে শীতল—

শীতল কে? বুঝে ওঠার আগেই ফেলুর মা অচিন্ত্যকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ব্যারাকবাড়ি থেকে এক এলোপাথাড়ি দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে ঢুকলো।

আর দেখতে পেল না অচিন্ত্য। জীবনলাল শীতলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

তাহলে ফেলুর মায়ের নাম শীতল। সবসময় মূর্তিমতী বিষাদ—ফেলুর মা। চলাফেরাও তার ধীর পায়ে। অচিন্ত্য কিছুটা অবাকই হলো। তার বাবা নাম ধরে ডাকতেই কেমন জলতরঙ্গ হয়ে পড়িমরি করে ছুটে গেল ফেলুর মা। অথচ এই ফেলুর মা জীবনলালের মেপে রাখা বস্তা থেকে ফেলু লঙ্কা নিয়ে এলে কতটা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তাও দেখেছে অচিন্ত্য।

জীবনলাল নামক বাবা মানুষটিকে তার এক সময় সিংহ মনে হতো। উদার, সাহসী। মন থেকে বাবার সে ছবি মুছে গেছে অচিন্ত্যর। মাসখানেক ধরে বাবাকে তার স্বার্থপর, লোভী মনে হচ্ছে। এখন তো—মানে এইমাত্র জীবনলালকে তার জাদুকর মনে হলো। কেননা সবসময় মনমরা ফেলুর মাকে

নাম ধরে ডাক দিয়ে জীবনলাল জলতরঙ্গ করে দিতে পারে এক লহমায়। সে তো কোনোদিন ফেলুর মাকে হাসতেই দেখেনি।

বাবাকে বা ফেলুর মাকে আর দেখতে না পেয়ে অচিন্ত্য আবার টালি-চালের সেই ব্যারাকের চাতালে উবু হয়ে বসলো। বসে স্প্রেয়ার মেশিনটাকে নিয়ে পড়লো।

ঘরে ঢুকেই জীবনলাল শীতলকে ইজিচেয়ারের চওড়া হাতায় বসিয়ে নিজে চেয়ারটায় আধশোয়া হয়ে বলল, এত নোংরা থাকো কেন? সাবান মাখতে পারো না। শাড়িও পাল্টাওনি—

শীতল ওরফে ফেলুর মা অনেকদিন পরে চোখ তুলে ঘুরে বসলো। তার-পর জীবনলালের মুখে তাকিয়ে বলল, তিনখানা কাপড় পাঠাও বছরে—ছিঁড়ে যায়—বেশি কাচলে ফেঁসেও যায়

ধানচাল তো থাকে। বেচে শাড়ি কিনে নিলে পার।

যে কাজ এতদিন করিনি—তা কি এখন করতে পারি!

এই ভালমানষি আমার ভাল লাগে না শীতল। সবাই আমার কাছ থেকে নেয়। তুমিও নেবে না কেন?

চিনুর মাকে যে-ই বিয়ে করলে তারপর থেকেই তো পাকাপাকি আমি এখানে। আমার পরিচয়টুকুও তো আমি চাইনি। অথচ—

বাকি কথাটা জীবনলাল নিজেই বসিয়ে নিল। অথচ তুমি আমার বিয়ে করা বউ!—বলেই গলার স্বর পালটে ফেলল জীবনলাল, ব্রিটিশ আমলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকতে তোমার সঙ্গে আচমকা একরাতে আমার মালাবদল করে বিয়ে হয়েছিল। সেটা আবার বিয়ে নাকি? ফার্স! আমার বয়সই বা কি ছিল? সতেরোও হয়নি তখন।

আমার ছিল তের। চোদ্দতে পা দিতেই ফেলু পেটে এল। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো স্বামী ভাবিনি। আর কারও সঙ্গে আমার বিয়েও হয়নি। ফেলুর বাবা তুমি—

চুপ কর। সেই থেকে বিয়ে বিয়ে করছে। বেয়াড়া মেয়েমানুষ এমন আর দেখিনি। ওটা আবার বিয়ে নাকি শীতল!

তোমার বিয়েও হয়েছে। ছেলেও হয়েছে। ফেলুই তোমার বড় ছেলে।

রাখো তো। একটা বোকা পাগল আমার ছেলে হয় কি করে?

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো শীতল। চোখ মুছলো। বোকা হোক—পাগল হোক—ও-ই তোমার ছেলে। বড় ছেলে।

চুপ !

আমি চুপ করে আর থাকবো না। তোমার মান রাখতে আমি এতদিন বিধবা হয়ে থেকেছি। এবার আমি সধবা হব। দেখি কে আটকায়।

চুপ কর। যে কথা বলতে এলাম—যে জন্যে এলাম—তাই-ই ভুলে যাচ্ছি।

বল।

হ্যাঁ। ছাখোতো—এই বালাজোড়া কেমন হলো।

ওই মায়ার জন্যে তো ? বুঝেছি। ভালই মানাবে।

বলছো—

হুঁ। আমাকেও অমন একজোড়া দিও তো।

সোনা আমার ভেসে যাচ্ছে যেন ! জনে জনে বালা দিতে হবে !!

একটা কথা বলি তোমায় ফেলুর বাপ।

আধশোয়া জীবনলাল ইজিচেয়ারে উঠে বসলো। কি কথা ?

মেয়েটা বোধ হয় অনেক দিন আগে—যা আমার মনে পড়ছে—তোমার ছেলের সঙ্গে—চিনুর সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছে ক'বার।

কি বলছো ?

হুঁ। আমার চোখের ভুল হয় না। কলেজেটলেজে পড়ার সময় হবে। বেশ অনেক দিন আগে। মুখখানা আমি ভুলিনি।

চিনুটা তো বড় বয়ে গেছে ?

কে কাকে বলে ! তুমি যাওনি। এখন ছেলের সঙ্গীর সঙ্গে আশনাই ! লজ্জা করে না তোমার ?

মুখ সেলাই করে দেব। চুপ কর।

এ কথায় কান না দিয়ে শীতল বলল, চিনুকে যেমন কাজকর্ম দেখতে দিয়েছো—ওকেও তো কোনো ভার দিতে পারো—

কাকে !—বলে হো হো করে হেসে উঠলো জীবনলাল। ওই বোকা পাগলকে !

ওই বোকা পাগলই তোমার ছেলে, ভুলে যেও না।

আঃ ! আমাকে ওসব কথা মনে করাতে এসো না শীতল। একটা জরদ্গবকে আমার ছেলে বলে চালাতে এসো না।

অমন চাবকালে ছেলে তো জরদ্গব হবেই। সেদিন কি সামান্য ব্যাপারে ফেলুকে ধরে চাবকাতে চাইছিলে—

সামান্য ব্যাপার ? ধানক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছিল। আর

সেটাই হলো সামান্য ব্যাপার ? আহ্লাদ দিয়ে তো—

কথা শেষ করতে পারলো না জীবনলাল।

কত আহ্লাদ দিয়েছো তুমি নিজে—তা জানো না! সেই ছোটবেলা থেকে ওকে পেলেই চাবকে আসছো ছুতোয় নাতায়। বাপের স্নেহ পায়নি কোনো-দিন। জানেও না—ওর বাবা কে। ধানের গাদির পাশে এক ইটের চাতালে শুয়ে শুয়ে আমারই মাথার চুল পেকে গেল।

বয়স হয়েছে তাই পেকেছে শীতল। এসব কথা শোনার সময় নেই আমার।

আজ তোমায় শুনতে হবে। আমার অনেক কথা বলার আছে। বিয়ে করে আমায় বউ করোনি ?

আঃ! আমার ভালো লাগছে না শীতল। আমি চলি—

দাঁড়াও। ছেলেটা তোমায় জানে—এই খামার—জমি জায়গার মালিক বলে—বাবু বলে—বাবা নয়! এরপর যদি বোকা পাগল হয়ে যায়ই—

শীতলের গলা বুজে এল। সে জানলার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

অমনি জীবনলাল লাফিয়ে জানলার কাছে গেল। কে ? কে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল যেন। নিশ্চয় ফেলু—বলে বাইরে ছুটে গেল জীবনলাল।

একটু পরে ঘরে ফিরে এসে বলল, নাঃ! কাছাকাছি কেউ তো নেই।

এ কথায় শীতল একটি কথাও বলল না।

আমার কি কোনোদিন স্বাভাবিক জীবন হবে না ?

এই প্রশ্নটা ইদানীং অচিন্ত্য প্রায়ই নিজেকে করে। এখন সন্ধ্যেবেলা দূরে জেলা সদরে ভোটযুদ্ধের পরিণাম মাইক যুদ্ধ। তার ফিকে আওয়াজ সব সময় এই ফাঁকায় ভেসে আসছে। নিজেকে অচিন্ত্যর সব সময় মনে হয়—শীগগিরি ফেটে যাবে এমন একটা ডিনামাইটের গায়ে সে বিছানা পেতে বসে আসে। তার আর যাবার জায়গা নেই।

মানুষের বাবা থাকে—সে বাবা সর্বংসহা হয়ে সংসারের ভার নেয়। আমাদের বাবা তো তা নেয় না। বরং উল্টো। আমাদের বাবা এমন কেন ? আমাদের সংসারটাই বা এমন ছত্রাখান কেন ?

ছোটমা ওরফে ছোটমাসী নিজেরটা আগলাতেই ব্যস্ত। জানেই না—তার

সেই দুর্গে সুড়ঙ্গ কাটা সারা। আমার মায়ের কোনো অভিযোগ নেই। সে সব দেখে চলেছে শুধু।

এই অবস্থায় গোদের ওপর বিষফোঁড়া—জীবনলালের লোকসভায় ইলেকশন। আর সেই ইলেকশনের ল্যাংবোট বিধানসভার ভোটে মায়া পালিত। শহর—শহরের গা ঘেঁষে জীবনলালকে জড়িয়ে রীতিমত সরস নাটক এখন দোলের রঙ-গোলাজলের মতোই চারদিক গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কোথাও বা তলানী চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।

এমনিতে জীবন-চটি থেকে শহর চিরে এই খামারবাড়ি আসার পথে অচিন্ত্যকে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু সবাই চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তবু দেওয়ালের শ্লোগান অচিন্ত্যর চোখে পড়ে। কানে আসে গরম জলের মতোই সব কথাবার্তা।

এই মায়া তাকে সব ছেড়েছুড়ে পড়াশুনোয় ফিরে আসতে বলেছিল। চেয়েছিল—অচিন্ত্য ক্যারিয়ার করুক। তখন অচিন্ত্য তার বিশ্বাস মতো তার বুড়ো পার্টির রক্তে মজ্জায় ভিটামিন দেবার জন্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার সেই এগিয়ে যাওয়া—নেবার কেউ নেই। অন্ধ কবন্ধ গুরুমশাইরা নিজেদের বুদ্ধিমত পার্টির কবর খুঁড়ে চলেছে। আর যারা গণতন্ত্রের নামে ভুল বুঝিয়ে গণতন্ত্রেই সুড়ঙ্গ কাটছে—সব ধসিয়ে দেবে বলে—আজ তারাই লাভবান।

এই বিপুল বিয়োগান্ত নাটকের পাদপ্রদীপে ফ্লাডলাইটের আশেপাশে আলোর পোকা হয়ে উড়ছে জীবনলাল চট্টরাজ। তার নিজের বাবা। সে কিনা অতীত গৌরব সম্বল করে নিজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে চাইছে ভোটারদের সামনে। ঢেকে রাখতে চাইছে নিজের ভেতরকার ছবি—যা পোকায় কাটা।

এক এক সময় সে বুঝতেই পারে না—তার বাবা আসলে কী চায়! ভোট? ক্ষমতা? সর্বক্ষণ অনন্তকালের নায়ক হয়ে থাকা? জীবনের ধর্মে পেশী তো একদিন শিথিল হবেই। একথা সব বুঝেও ভুলে থাকে কি করে মানুষটা?

দাঁড়িয়ে গেল অচিন্ত্য। ভোটের জীপে চড়ে মায়া পাস করলো। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে। পায়ে স্ট্র্যাপ বাঁধা কাবলি জুতো। সাদা খোলের শাড়ি। তাতে গাঢ় সবুজ পাড়। পাড় মিলিয়ে ম্যাচিং ব্লাউজ। কাঁধ থেকে নেমে আসা দামি চামড়ার ব্যাগের স্ট্র্যাপ। ব্যাগের পেটটা ফুলে ঢাউস।

কেন ফুলে আছে অচিন্ত্য তা জানে। জীবনলাল চট্টরাজকে এবার লোক-সভায় জিততেই হবে। জিততে গিয়ে তার আগেকার ছবি ভোটারদের মনে যতই ঝাপসা দেখছে জীবনলাল—ততই টাকা ঢেলে সে ছবিকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্যে লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। অচিন্ত্য জানে—পার্টির ষ্টেট লেভেলে—পার্টি সেন্ট্রাল থেকে যে টাকাই আসুক—তার ভূতভবিষ্যৎ জীবন-লালের হাতে। আর এটাও জানে জীবনলাল—লোকসভায় জিততে হলে—বিধানসভায় সিটে মায়াকেও জিততে হবে।

চোখের সামনে এক পলকে মায়া মিলিয়ে গেল। এখন যা সময়—এখন কোনো পাবলিক মিটিং হতে পারে না। মায়া নিশ্চয় বাড়ি ফিরছে। অচিন্ত্যও অমিয়নগরের রাস্তা ধরলো।

ভাবতে গিয়ে অবাক হলো অচিন্ত্য। দুঃখও বোধ করলো। একদা অমিয় আর জীবনলাল নামে দুটি কিশোর দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরাধীন আমলে। আজ একজনের নামে সদর শহরের সঙ্গে একটি নগর—বা বসতি—যার নিজের নামে ডাকঘর। আরেকজন যতই জীবনে এগোচ্ছে—ততই চারদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে—আর জীবনটা কুৎসায় বদনামে মাখামাখি হয়ে উঠছে।

অমিয়নগরের দিকটা কিছু শান্ত। দূরে গৈবিনাথের মন্দিরে আজ বোধ হয় কিসের পুজো। তাই সুলতানগঞ্জের দিক থেকে মাঝে মাঝেই ঢাকঢোল কাঁসরের আওয়াজ।

মায়াদের বাড়িটা ছিমছাম। সিমেন্টের মেঝের ওপর চ্যাচারির বেড়া। ওপরে রঙীন টালি। সে টালি ঢাকা পড়েছে লতায় পাতায়—বাহারি ফুলে আর ঝুলিয়ে দেওয়া লতানে গাছের ডালপালায়।

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো অচিন্ত্যর। এই মায়া একসময় তাকে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে বলেছিল। যাতে কিনা তার ক্যারিয়ারের সঙ্গে মায়ার ক্যারিয়ার সমান্তরাল হয়ে ওঠে—জীবনে জুটি বাঁধায় কোনো গোলমাল না হয়।

মায়ার গায়ে গা লাগিয়ে দেখেছে অচিন্ত্য। তখনো ও লোকাল কলেজে। ওর হাত—গাল—শরীর সব গময় পরম। এখনো কি তাই আছে? এমনিতে খুব ভীত ছিল। ভীষণ লজ্জা? সেই মেয়ে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে মড়াটড়া কেটে এখন না জানি কতটা পালটে গেছে।

অমিয়কুটীরের ঠিক পেছন দিয়ে একটা খাল গিয়ে পড়েছে কালীগঙ্গায়। খালে জল বলতে জেলেদের বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা খানিক ঘোলা জল—তাতে

একটা ভাসন্ত নৌকো।

অচিন্ত্য গিয়ে সেটায় উঠলো। এখানে তাকে কেউ আশা করবে না অচিন্ত্য নৌকোর পাশে গেঁথে দাঁড় করানো লগি ধরে দাঁড়ালো। মায়াদের ঘোরদোর—উঠোন—মায়ার চেম্বার—কুয়োতলা সবই দেখা যাচ্ছে। চোল কলমির ঘন বেড়া দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। শীত আসবো আসবো। তবু বাতাসে গরম।

মাথার লম্বা চুলে সুগন্ধি তেল ঘষতে ঘষতে মায়া এসে কুয়োতলায় দাঁড়ালো। এলো করে পরা শাড়ি।

দিদি জল তুলে দিই।

না। তুই যা—আমি তুলে নেব।

কাজের মেয়েটি চলে যেতেই মায়া ব্লাউজটা খুলে চ্যাচারির বেড়ায় রাখল। বার বাঁধনে শরীর স্বাস্থ্যে গর্ব মেশানো। চোখের চশমাটা খুব সাবধানে মায়া কুয়োর পাড়ে রেখে বালতিটা কুয়োয় ফেলল। কপিকল দিয়ে দড়ি গড়িয়ে নামলো গ-র-র-র্ মতো একটা শব্দ তুলে।

অচিন্ত্য চোখ ফেরাতে পারছিল না। কোথায় সেই কলেজ জীবনের মায়া! কোথায়ই বা এম. বি পড়ুয়া মায়া!! তাকে এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কতই না বদলে গেছে। স্তব্ধ—শান্ত—গম্ভীর—ভর্তি মায়া। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অচিন্ত্য নৌকো ছেড়ে তীরে উঠলো।

আর অমনি মায়া চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে এখানে? বলে অন্ধের মতোই নিজের চশমাটা হাতড়ে হাতে তুললো।

ভাগ্যিস চশমা চোখে ছিল না মায়ার। খুঁজে চোখে পরার ভেতরেই সেই আদুর গায়ে শান্ত মূর্তির বহু দূরে সরে এল অচিন্ত্য। দৌড়তে দৌড়তে। অমিয়নগরের হাতার বাইরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বুঝতে পারলো—চশমাবিহীন প্রায় অন্ধ মায়ার কানে তার পায়ের নিচে শুকনো পাতার গুড়ো হয়ে যাওয়া শব্দ গিয়ে পৌঁছেছিল। নইলে তো মায়ার টের পাওয়ার কথা নয়

এই অবস্থায় ঘোরে পাওয়া মানুষের মতোই সারাটা বিকেল অচিন্ত্য জেলা সদর শহরে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। আর যতই ঘোরে—ততই তার মনে হয়—আদুর গায়ে মায়ার গ্রীবা, উদ্ধত বুক, খসে পড়া শাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা কোমরের খাঁজ—সবই আগেকার মায়ার গায়ের মতো গরম? না, এখন—ঠাণ্ডা? শান্ত?

এইসব ভাবতে ভাবতেই অচিন্ত্যর শরীরটা রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে

অরো অরো হয়ে উঠলো। সে নিজের মনকে বলল, ক্ষমতার জন্যে মায়া? সুখের জন্যে মায়া? ভালোবাসার জন্যে মায়া? এইসব জিনিসের জন্যে তুমি জীবনলালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছো? সিকিউরিটির জন্যে মায়া?

একজন তার বাবা। অন্যজন তার একদা সহপাঠিনী। অবলা নয়। ডাক্তার। নিজেদের বাড়ি ঘোরদোর আছে। শান্তি কাকীমা ফ্রিডম ফাইটারের পেনশন পান। মায়ারও প্র্যাকটিশ খুব খারাপ নয়। আসলে এই দুনিয়ায় কোথাও বিশুদ্ধ প্রেম বলে কিছু নেই।

জীবনলাল লোকটা না হয় নিজেকে অমর যুবক মনে করে। কিছুদিন অন্তর সে অনন্ত যৌবনের ফেরিওয়ালা হয়ে এখানে সেখানে গিয়ে বসে। তখন জিনসের কোমরের বেল্টের ভেতর তার মধ্যদেশ আরও যুবজনোচিত হয়ে পড়ে। তাই বলে—তুমি? তুমি মায়া?

নিজেকে কেমন ঠকে যাওয়া লাগতে লাগলো অচিন্ত্যর। আবার নিজেকেই নিজে বোঝালো অচিন্ত্য—মায়া তো আমায় ঠকায়নি। সে তো আমার জন্যে অপেক্ষাও করেছিল কিছুদিন। বরং—তখনকার বোধবুদ্ধি মতো আমিই মায়াকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছি তখন—সবাই যদি ক্যারিয়ার করে।

আর মায়া তো এখন আলাদা করে একজন পূর্ণনারী। সে কোথায় আনন্দ পাবে—পাহারা পাবে—সে তো ভালো করেই বুঝবে। আর সেই মতোই চলবে। জীবনলাল ছাড়া কে-ই বা ওকে কোনো ব্যাকগ্রাউণ্ড ছাড়াই একেবারে গোড়াতে বিধানসভায় দাঁড়াবার টিকিট দেবে!

জীবন-চটিতে ঢুকতে ঢুকতে সন্ধ্যে হয়ে গেল অচিন্ত্যর। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার। কার গলার শব্দে থমকেদাঁড়ালো অচিন্ত্য। কে রে? কে ওখানে?

আমি বলে উঠে দাঁড়ালো রানী। সোমনাথের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

অচিন্ত্যর ছোটবোনের পাশে অন্ধকারের ভেতর থেকে সোমনাথ নামে ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো।

এই শীতে মাঠে কেন? ভেতরে গিয়ে বোসো।

রানীই বলল, না দাদা। ওখানে ভোটের ভলান্টিয়াররা আঠা জাল দিচ্ছে। আজ সারারাত পোস্টার মারবে।

কিন্তু ঠাণ্ডায় যে কালিয়ে গেছিস তুই—বলে অচিন্ত্য রানীর বাঁশপাতার মতো পাতলা দুখানা হাত নিজের দু'হাতের ভেতর নিল। সত্যিই ভীষণ ঠাণ্ডা।

নিচের বড় ঘর থেকে খানিকটা আলো এসে পড়েছে রানীর মুখে। সেই আলোর ভেতরেই রানী বলল, না দাদা। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়।

এই কথাগুলো বলার সময় রানীর মুখখানা বড়ভাই হিসেবে অচিন্ত্যর বুকের ভেতর ছাপা হয়ে গেল পাকাপাকি। মেয়েটার দাঁতগুলো ফাঁকফাঁক। মুখে কুণ্ঠার হাসি। সোমনাথ বোধহয় কোনো ক্লাসফ্রেণ্ড। কিংবা নতুন বন্ধু—বাবার ভলান্টিয়ারদের ভেতর থেকে উঠে এসে থাকতে পারে। জীবন-চটির জীবনে মা আর রানী সব সময় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে আছে। গলার স্বরটি পর্যন্ত শোনা যায় না। জীবনলালের দাপটে এখানে বাকি সবাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। রানী কি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে? বাবা কি এসব দেখে? না, দেখার প্রয়োজন বোধ করে?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রানীর জন্যে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। ছোটমাসী এ সংসারে ছোটমা হয়ে আসা ইস্তক মা কেমন ধীরে ধীরে পর্দার পেছনে চলে গেছে—তা তো অচিন্ত্য নিজেই দেখে এসেছে। আর এই পালাবদলের একেবারে গোড়ায় রানী ছিল শিশুটি। বড় আদরের বোন। বড় হতে হতে সব বুঝতে পেরে রানীও কেমন অনেকদিন হলো নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

মাঝ সিঁড়িতে থেমে দাঁড়ালো অচিন্ত্য। সোমনাথ আর রানীকে ডেকে এনে নিচে বসাবে? ওরা ভদ্রমতো কোথাও বসে কথা বলতে পারতো। এখন যে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ছে। রানী একটা চাদরও গায় দেয়নি। সারা-দিন গরম থাকে। কিন্তু রাত হলেই ঝুপ ঝুপ করে শীত পড়ে। রানীর কালো মাড়ি। চোখের গর্তে চোখ অনেক পেছনে। অপুষ্ট শরীর। ডিগ্রি ক্লাসে পড়ুক আর যা-ই করুক—কে বিয়ে করবে রানীকে। সম্বন্ধ করে তো নিশ্চয় নয়। সবটাই আসলে রানীর অনিশ্চিত।

ক্লান্ত পা টেনে টেনে দোতলায় উঠে এল অচিন্ত্য। নিচের বড় বৈঠক-খানার ঠিক ওপরেই দোতলায় বড় ঘরখানা। সেখানে এখন আলো নেই বলতে প্রায়। ভালো করে তাকিয়ে অচিন্ত্য দেখলো, জীবনলাল সেই ইজি-চেয়ারে বসে। গিলে করা ধুতির কোঁচায় টেবিল ল্যাম্পের আলো। মনে হচ্ছে কোঁচানো কাগজ। টিপয়ের ওপর টেবিল ল্যাম্পের পাশেই একটা উপহারের বাক্স। জীবনলালের মাথা আঁচড়ানো। গায়ে স্যাণ্ডো। এখুনি বোধহয় গায়ে পাঞ্জাবিটি চড়িয়ে কোনো নেমন্তন্ন রাখতে যাবে জীবনলাল। এইভাবেই তো বাবা গিয়ে থাকেন।

বিশাল ঘরখানার মাঝখানে টেবিল ল্যাম্পের ঘেরটোপের ভেতর একজন সুখী দাপটিয়া মানুষের শরীরের খানিকটা। ধুতির কোঁচা। উপহারের বাক্স। আর ছোট্ট টিপয়ের চাতাল।

দূরে ঘরের দোরে প্রায় অন্ধকারে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানো অচিন্ত্য এবার চমকে উঠলো। জীবনলাল বাক্সটার ডালা খুলতেই অচিন্ত্যর মাথায় রক্ত উঠে এল। জীবনলাল কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে ছুটে গিয়ে বাক্সর ভেতর থেকে বালাজোড়া কেড়ে নিল।

কে? বলে জীবনলাল উঠে দাঁড়ালো।

আমি।

আমি? আমি কে? এভাবে?—

অচিন্ত্য বুঝলো, সিংহের চোখে জোর কমে এসেছে। সে শান্ত গলায় বলল, আমি অচিন্ত্য। দাঁড়াও। বড় আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।—বলেই দেওয়ালের সুইচ টিপে দিল।

রাগে জীবনলাল তখন কাঁপছে। অচিন্ত্য দেখলো, কোত্থেকে তার মাও ছুটে এসেছে।

তুমি? তুমি এভাবে—

হ্যাঁ আমি। তোমার কথামতো আজ প্রায় দু'মাস আমি খামারবাড়িতে। সারাদিন চাষবাস দেখি। যে ভার দিয়েছো আমি তা দেখি বাবা। মাঝে মাঝে এখানে আসি। আগেই অনেককিছু শোনা ছিল। এবার চোখে সব দেখলাম।

অচিন্ত্যর কথাও শেষ হলো—অমনি তার মা দোরগোড়ায় খিলখিল করে পাগলের হাসি হেসে উঠলো।

হাসির শব্দ শুনে জীবনলাল সেদিকে তাকাতেই সে হাসি মুহূর্তে নিভে গেল। জীবনলাল রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, বালাজোড়া বাক্সে যেমন ছিল—এতে রেখে যাও খোকা—

না। এ বালা আমি রানীর বিয়ের জন্য তুলে রাখবো। তুমি যেমন বেরোচ্ছিলে ঘুরে এসো। শুধু হাতেই আজ না হয় ঘুরে এলে বাবা।

তার মানে?

মানে তুমি ভালোই জানো বাবা। আমাদের ছোটমাসী কি করে ছোটমা হলো—তখন অল্পবয়সে বুঝিনি। এখন বুঝি। আরও অনেক জানি। সামনে ভোট। এখন আমাকে ঘাঁটিও না বাবা—

বলি বৃন্দে। কার কথা তুই ভাবিস বসে বসে—?

এ সময়টায় ঘরে বসে থাকার মানুষ নয় জীবনলাল। গেল হপ্তায় জনসভা করতে করতে সে সেহারাবাজার অব্দি চলে গিয়েছিল। সকাল দুপুর মিলিয়ে দিনে আট নটা করে জনসভা। তার ধকল সইবে কেন গলা। মুখে কথা ফুটছে না জীবনলালের। গলা বসে গেছে।

অচিন্ত্যর মা জল ফুটিয়ে তাতে বাসকপাতা ডুবিয়ে গুনগুন করে গাইতে গাইতে এসে বড় এনামেলের বাটিটা ঠক করে টিপয়ের ওপরে রাখলো।

খুব গরম ?

তা একটু গরম তো হবেই।—বলেই অচিন্ত্যর মা ফের গান ধরলো—

আমি মরি ভেবে ভেবে
আর তুমি হেসে হেসে
নন্দের বাগানে
ফুল ফুটায়ে ছোটো-ও-ও

চুপ কর বলছি। চুপ কর—

ওমা। গান গাইছি তাতেও আপত্তি ? তার চিন্তায় বাধা পড়ছে ?

কার চিন্তা বল বুড়ি ?

উঁহু। লাঠি নিয়ে উঠো না। লোকে তোমাকেও বুড়ো বলবে চিনুর বাপ। তুমি তো এখনো ছোঁড়া। দিব্যি লাট খেয়ে ফিরছো। বালা গড়াচ্ছো। সোনার হাতে সোনা পরাবে। যদিও ঘরে তোমার পাত্রস্থ করার মেয়ে মজুদ। কিন্তু নিজেই যে বর হবার সাধ করেছো ঋষিমশাই—

চুপ কর বুড়ি।

তা নয় করলাম। এবার গরম জলটা দিয়ে গারগেল কর !

করব না।

ভাখো দিকি। নিজের ভালো বোঝে না। আজ বাদে কাল ভোট। সঙ্গে ল্যাংবোট বিধানসভা। তেনাকেএ তো তরাতে হবে। যাই শান্তিদিকে গিয়ে বলি—তোমার জামাইটা কত অবুঝ।

হাতের কাছে অ্যাশ্ট্রেটা ছিল। সেটা তুলে ছুঁড়ে মারলো জীবনলাল। সকালবেলা এই সময়টায় এ ঘর ফাঁকাই থাকে। মাথা সরিয়ে নেওয়ায় অচিন্ত্যর মায়ের গায়ে লাগেনি। ঝনঝন শব্দ তুলে অ্যাশ্ট্রেটা দুই বাটি হয়ে গড়িয়ে পড়লো ঝুল বারান্দায়।

আহা। রাগ করে না।—বলে ছোট ছেলে ভুলোনোর ছড়া গাওয়ার

কায়দায় গাইতে গাইতে অ্যাস্ট্রেটা বারান্দা থেকে কুড়িয়ে আনলো অচিন্ত্যর মা। এনে বলল, এত রাগ ভালো নয় শরীরে। আমি না হয় বউ। আমি সহ্য করলাম। কিন্তু পাবলিক সইবে না বলে দিলাম।

থামবি বুড়ি। দে এক কাপ গরম জল তুলে দে—

এই তো গলা ফুটছে। এবার নিজে তুলে নাও তো। দিব্যি পারবে।

জীবনলাল বার দুই গারগেল করার পর অচিন্ত্যর মা রসিকতার ঝাঁঝটা নিজের গলা থেকে মুছে নিয়ে বলল, সেদিন কিন্তু কাজটা ভালো করোনি।

জীবনলাল মুখ তুলে তাকালো। অচিন্ত্যর মা সেই মুখে জীবনলালকে সামান্যই খুঁজে পেল। কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথাতেও একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চোখ আগের মতো আর তেমন উজ্জ্বল কোথায়! দমের বাইরে বেরিয়ে লোকটা সারাজীবন দৌড় করে বেড়াচ্ছে।

কি কাজ?

ফেলুকে অমন চাবকালে কেন?

চাবকাবো না? আমার ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে—

হাজার হোক তোমার বড় ছেলে।

বয়ে গেছে। কী আমার বড় ছেলে রে! মালা বদলের বে! তারপর কখন ছেলে হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি।

ওইভাবেই সব ছেলে হয়। ফেলুরও তো চল্লিশ হতে চলল।

বনমানুষের আবার বয়স। ভাবছি মহেন্দ্রটাকে তুলে দিয়ে ফেলুকেই সহিস করবো। ওর তো ঘোড়ায় কোনো ভয় নেই।

ছিঃ। ছিঃ।

কি হলো?

কি বলছো বোঝো না? নিজের ছেলেকে সহিস বানানো? কেন? তোমার টাকা কমে গেছে? ধানের দাম বেড়েছে—লঙ্কার দাম বেড়েছে। খামারবাড়ির আয় আগের চেয়ে এখন দুগুনো।

তাই বলে অপচয় করবো?

কিসের অপচয় শুনি?

মহেন্দ্র বুড়ো হয়ে গেছে। সে তুলনায় নিজের তাগড়া বুনো ছেলেটাকেই যদি সহিস বানাই তো সবদিক দিয়ে লাভ। ভয়ডর জানে না ফেলু। টাঙ্গা দিব্যি চালাতে পারবে। আমারও তো বয়স হচ্ছে। সহিস-কাম-বডিগার্ড দরকার তো আমার একজন।

কেন? জননেতা হয়েছো। তোমার আবার বডিগার্ড কিজন্যে?

কত শত্তুর চারদিকে ভাখো না।

শত্তুর তোমার নিজের ভেতরে। ছিঃ ছিঃ। শেষে ফেলু হবে সহিস। ফেলু হবে বডিগার্ড?

খারাপ কি? মাইনের টাকাটা বাড়ির ভেতরেই থাকলো। মাইনে পেয়ে ফেলু টাকাটা ওর মায়ের হাতে দেবে।

সে টাকা বড়দি হাত পেতে নেবেন?

নেবেন। কেন? নেবে না কেন? টাকা তো।

আমাকে বিয়ে করার পর ভুলে যেও না—বড়দি এ বাড়ির কিছুই ছোঁননি। সেই যে খামারবাড়ি গিয়ে থিতু হলেন—এদিকে আর আসেননি। ভুলে যেও না—এ সংসার তাঁরও।

কোনো জবাব না দিয়ে জীবনলাল পর পর দুকাপ জল মন দিয়ে গারগেল করলো। তারপর বলল, কাকে তুমি আপনি আজ্ঞে করছো? শীতলকে? স্বাধীনতার আগে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকতে না বুঝে বে করেছিলাম। মালা বদলের বিয়ে। তাতে যদি একটা অপগণ্ড জন্মে থাকে থাক না। তাকেও ছেলে করে নিতে হবে? আব্দার তো কম নয়—

আব্দার করছো তুমি। বোঝো না কিছু—অথচ বিয়ে করতে তো আটকায়নি। সহবাসও বন্ধ থাকেনি। তোমরা সেকেলে বিপ্লবীরা বড় আব্দারে। ঘুমের ভেতর তোমাদের ছেলে হয়ে যেতো।

সকালের শীত ভোরের রোদ গুঁড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল। জীবনচটির বাইরে সারা শহর জেগে উঠছে। জানলা দিয়ে দেখা যায় সদর শহরের বাইরে বেরিয়ে ত্রিপল মুড়ি দেওয়া লরি একটার পর একটা কালীগঙ্গার গা দিয়ে অক্ষয়কালীর মোড় পেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ছে।

জীবনলালের কাছে পাকা খবর, আজ বড় পার্টির ক্যাণ্ডিডেট হাতির মিছিল বের করবে। অন্তত গোটা সাতেক হাতি ওরা জড়ো করেছে। হাতিদের গা জুড়ে থাকবে কিংখাবের ঝালর। গলায় ঘণ্টা। মাহুতদের পরানো হবে যুবরাজের পোশাক। কলকাতা থেকে থিয়েটার পার্টির ঐতিহাসিক পালার সব পোশাক আমদানী করা হবে।

এ মিছিল দেখতে লোক নিশ্চয় ভেঙে পড়বে। ভোটের আসল কথা লোক জড়ো করা। ক্রমাগত লোক জড়ো করে যাও। কানের কাছে একই কথা বলে যাও। এরই নাম গণতন্ত্র। এই পথেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বিকশিত

হয়ে আসছে। লরি ভাড়া কর। তাতে লোক ভাড়া করে ভর্তি করে শহরে চলে এসো। হাতে গড়া রুটি আর কুমড়োর ছক্কা রেডি রাখতে হবে। নয়তো এত লোক খাবে কি? সঙ্গে লেডিকেনি দিলে খুব ভালো হয়।

সব জিনিস সময়মতো করতে পারলে—জনতা তোমার নাম দিয়ে—জয় কি—জয় কি বলতে বলতে মিছিল করে চলে যাবে।

এজন্যে চাই নগদ টাকা। অঢেল নগদ টাকা। না থেমে খরচা করে যেতে হবে। তবেই না ভোট, ভোট হয়ে দাঁড়াবে। পাশাপাশি চাই জাল ভোটের মেশিনারি। সব রাস্তাতেই ছুটকো ছাটকা নাবালকদের ধরে ভোটার করে যেতে হবে।

কিন্তু ওরা যে আজ হাতি বের করছে—

সকাল থেকেই বাতাসে সিমের গন্ধ। এমনিতে নতুন শীতের ভোরে বাজার যেমন বসার তেমনি বসেছে। ডাক্তারবাবুরা তাদের চেম্বার খুলে বসে। সাইকেল মেরামতির দোকানে দিব্যি অনেকে টিউবের লিক সারাই করছে। খুচরো পার্টিগুলো—যাদের জামানত জব্দ হবেই—তারা সাইকেলে ভ্যানে ব্যাটারি সেট মাইক বসিয়ে নিজের নিজের ক্যাণ্ডিডেটের গুণকীর্তন করে চলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে—বুঝিবা রাজ্য লটারির টিকিট ফিরি করে বেরিয়েছে।

বেশ রাত থাকতেই জীবনলাল শহরের বাইরের গোডাউন, বটতলা, বাস স্টপে নিজের আর মায়ার পোস্টারিং দেখতে বেরিয়েছিল। তখনো শহর জাগেনি। শুধু দুরপাল্লার বাস স্টপে সবে চায়ের জল চাপাবার উনুনে কয়লা পড়েছে। ড্রাইভার জাগেনি। বাসের গায়ে শিশিরের ফোঁটা।

হাঁটতে হাঁটতে জীবনলাল অক্ষয়কালীর মোড়ে গিয়ে হাজির। কালীগঙ্গার মরা সোতায় কুয়াশা ভেদ করে জ্যোৎস্না পৌঁছতে পারেনি। তাই যতটা গভীর তার চেয়েও গভীর দেখাচ্ছিল কালীগঙ্গাকে। এই মোড়ে নারকেল তেলের এক বিরাট হোর্ডিংয়ের ওপর গত পরশু জীবনলালের ছবি দিয়ে বিশাল এক পোস্টার সাঁটা হয়েছে। বক্তৃতা দেওয়া অবস্থায় জীবনলাল। আগেকার ফটো দেখে আর্টিস্টরা আইভরি রংয়ে ছবিখানা এঁকেছে এমনইভাবে যে—রাতে লরি মোড় ঘুরলেই হেড লাইটের আলোয় জীবনলাল অন্ধকার আকাশের ভেতর চকচক করে উঠবে।

লোহার খুঁটিতে বিরাট টিনের ওপর নারকেল তেলের বিজ্ঞাপনটি আঁকা। শহরে ঢুকতে বেরোতে চোখে পড়বেই। কাছেই কালীগঙ্গার ওপর রেলের ক্রাইওভার। ট্রেনে বসেও এ বিজ্ঞাপন না দেখে উপায় নেই। অক্ষয়কালীর মোড় দিয়ে লাইট রেলের ইঞ্জিন যখন কালীগঙ্গার ওপর আগেকার সরু রেলের পোলে ওঠে তখনই চোখে পড়ে—তেলের বিজ্ঞাপনের মেয়েটি হাত মাথার পেছনে পাঠিয়ে চুল গুছি করে করে নারকেল তেল ঢলছে।

দুর্দান্ত এই স্পটটা মায়া বেছে দিয়েছিল। আমি বলছি—এই হোর্ডিংয়ে পোস্টার দাও, যদি না তেল কোম্পানী কোনো বাধা দেয়—

কিসের বাধা! ভোটের সময় ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

তাহলে আইভরি রংটা দিও পোস্টারে। আলো পড়লে জলজল করবে।

এজন্যই তো মায়া—বলে ডান হাতে লাগাম—বাঁ হাতে মায়ার কোমর জড়িয়ে ধরেছিল জীবনলাল। ক'দিন আগের কথা। খামারবাড়ি থেকে মায়া আর জীবনলাল ফিরছিল টাঙ্গায়। এখানে এসে মায়া নেমে যায় রোজ। সেদিন আর নামেনি। পরিষ্কার বলল—টাঙ্গা ঘোরাও। বেশি তো রাত নয়। ঠাণ্ডাও এমন কিছু বেশি নয়—

বেশ তো। বলেই মায়াকে ছেড়ে দিয়ে জীবনলাল ঘোড়াকে ঘোরালো। সামনে অগাধ অন্ধকার রাস্তা। পনের বিশ মাইলের আগে কোথাও ইলেকট্রিক নেই। কিন্তু আশেপাশে আছে। যেমন কিনা শহরের গ্রিড থেকে টেনে আনা লাইন দিয়েই খামারবাড়ির আলো জ্বলে, পাম্প চলে।

শহরের বাইরে টাঙ্গায় বসে অন্ধকার রাতে জীবনলালের মনে হলো—সে আবার—শেষবারের মতো যুবক হয়ে গেছে। মায়া তার বন্ধু অমিয়র মেয়ে নয়। এমনি একটি মেয়ে—যে কিনা তারই আদরে সোহাগে পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছে এইমাত্র। জীবনলাল গেয়ে উঠলো—

অনাদি কালের স্রোতে
ভাসিয়ে দিলেম মালা—আ—

অন্ধকারের ভেতর রীতিমতো নায়িকার মতোই ডান হাতে জীবনলালের ঠোঁট চেপে ধরলো, ও গান কেন আবার? ভাসিয়ে দিলেম—! কেন? এই তো আমি।

লাগাম হাতেই জীবনলাল মায়াকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরলো।

করছো কি? ছাড়ো। অন্ধকারে ঘোড়া ঘোড়ালো বেচাল হলে—?

হোক গিয়ে মায়া।

তা কি করে হয়। ক'দিন পরেই ভোট।

এখন আমার আর ভোট ভালো লাগে না মায়া। দু'জনে এমনি অন্ধকারে যদি টাঙ্গায় চেনা জগতের বাইরে চলে যেতাম!

তা হয় নাকি। ভোটে তাহলে সবাই হেরো বলে দুয়ো দেবে যে—

দিক গিয়ে। তোমায় তো জয় করতে পেরেছি মায়া।

তা হয় না। ভোটে তুমি জিতবে।

বলছো?

এত তো তোমার জেতা খেলা। আমিও জিতবো দেখো।

তুমি জিতবে জানি মায়া। তোমার নিজেরই আলাদা একটা ইমেজ আছে।

আমার ইমেজ? মিথ্যে কথা। আমি যে ক'টা ভোট পাবো—তা সবই তোমার ইমেজের জোরে।

মায়াকে আর কথা বলতে দিল না জীবনলাল। কোমরের পেছনে বাঁ হাতখানা লম্বা করে টেনে নিল। বুকের উপর ঢেউ হয়ে পড়তে পড়তে মায়া বলল, এবার তোমার ঘোড়া বিগড়ে গিয়ে টাঙ্গা ওলটাবে।

টাঙ্গা তখন অন্ধকার রাস্তার মাঝখানে থামিয়ে ফেলেছে জীবনলাল। রূপ কথা কিংবা ইতিহাসের রাজারাজড়ার অধ্যায়ে যেমন থামে—ঠিক তেমন-ভাবেই—অবিকল সেই ভঙ্গিতে ইতিহাসের কোনো জনপদের রাজার মতোই ঠোঁট ঠোঁটে রেখে জীবনলাল যৌবন, মায়া আর নিজের অনন্ত যৌবনের অভিনয় করছিল। তফাৎ যা—তা আলোর। রূপকথায় বা ইতিহাসে এইসব সময় দিনের বেলা থাকে। তার বদলে এখন এখানে সন্ধ্যে রাতের অন্ধকার। সময়টা—লোকসভার ভোটের কয়েকদিন আগে।

জীবনলালের দুই হাতে দুই অসুর ভর করেছে বলা যায়। সেই শক্ত বাঁধন থেকে আলগা হবার জন্যেই মায়া বলল, অন্ধকারে ঘুরে লাভ কি—চল যাই খামারবাড়িতে—

এই তো ফিরলাম সেখান থেকে।

তাতে কি। সারাটা এলাকাই তোমার।

তোমারও মায়া।

ওখানে আমার কোনো ভয় করে না—

অন্ধকারে খামারবাড়ির হাতায় ঢুকে টাঙ্গা থামালো জীবনলাল। তুমি এগোও—আমি ঘোড়া বেঁধে দিয়ে আসছি।

মায়া খানিকটা এগিয়েছে। তখন পেছন থেকে জীবনলাল আবার

ডাকলো। মায়া—ফেলুকে দেখলে পাঠিয়ে দিও তো।

অন্ধকারে ঘাসের জাজিমে পা ডুবিয়ে এগোতে গিয়ে অন্ধকার খামারবাড়ির ঢাকা বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো মায়া। পেছন ফিরে তাকালো।

জীবনলালের বাঁকানো পিঠ—বড় মাথা—লোহার গাঁইতি মার্কা শক্ত হাত দু'খানার আবছা ছায়া অন্ধকারে দেখতে পায় মায়া। ঘোড়া খুলতে খুলতে মায়াকে লুকিয়ে নিজের সবচেয়ে প্রিয় গানটি গাইছে জীবনলাল—কাননদেবী-অশোককুমারের ডুয়েট—

অনাদিকালের স্রোতে ভাসা
মোরা দুটি প্রাণ
নয়নে নয়নে জানি গো—ও-ও

জীবনলালের গাঢ় গলা নীলচে অন্ধকারে গলে পড়ছিল। সুর নেই। কিন্তু আকুতি আছে। সে আকুতি গলা থেকে গড়িয়ে ঘাসে গিয়ে পড়ছিল। নানান শব্দে অভ্যস্ত ঘোড়া চোখের ঘেরটোপ খুলতেই সিধে একবার মাথা তুলে শীতের ভারি আকাশ ছুঁতে চাইলো। ভারি দাম্ভিক ঘোড়া। তাই তো মনে হলো মায়ার। হাজার হোক জীবনলালের ঘোড়া তো!

অন্ধকার ঢাকা বারান্দায় উঠে খানিক এগিয়ে সামনেই বড় ঘর। আর বারান্দার হাতা বরাবর লম্বা টানা জমিতে পাকার মুখে ঝুলে পড়া ধানের শীষ—তিরিশ বত্রিশ বিঘা জুড়ে। ভেজানো দরজা ঠেলতেই ঘরের ইলেকট্রিক আলো লাফিয়ে পড়লো মায়ার মুখে। কে?

ঘরে আলো জ্বেলে খোলা জানলার শিক ধরে কে দাঁড়িয়ে—জানলার বাইরে অন্ধকারে তার চোখ।

মায়ার চমকানো গলায় ফিরে তাকালো অচিন্ত্য।

তুমি? এখন? এখানেও তুমি?

বাঃ! এটা আমার বাবার বাড়ি মায়া।

মায়া ঘরে ঢুকলো না। দরজায় দাঁড়িয়েই বলল, জানি। সব জায়গায় তুমি আমাকে ফলো করবে!

মায়া কথা বলছিল—আর অচিন্ত্য দেখতে পাচ্ছিল—মায়ার নাক দিয়ে কথার সঙ্গে রাগ আর চড়া ঘেন্না হিংস্র বাতাস হয়ে বেরিয়ে আসছে।

আমি তোমায় ফলো করতে যাবো কেন!

তা জানি না। এটা কি?—বলতে বলতে মায়া তার হাতব্যাগ খুলে একটা রুমাল ছুঁড়ে দিল অচিন্ত্যর দিকে।

কুড়িয়ে নিয়ে অচিন্ত্য বলল, এর মানে ?

সুতো দিয়ে কার নাম লেখা আছে ছাখো।

এবার রুমালটা চিনতে পারলো অচিন্ত্য। তার ছোট বোন রানী রুমাল-খানা বানিয়ে সুতোয় তার নাম তুলে দিয়েছিল। এ রুমাল কোথায় পেলে মায়া ?

মায়া হাসলো। পেলাম ? আমাদের কুয়োতলায় পেছনে খালপাড়ে শুকনো পাতার ওপর পড়েছিল। বাড়ির কাজের মেয়ে পেয়ে কুড়িয়ে এনেছে। যেদিন লুকিয়ে আমার চান করা দেখতে গিয়েছিলে—সেদিন—আমি চমকে ওঠায়—পালাতে গিয়ে—

ছিঃ! ছিঃ! এতটাও নিচে নামতে পারো তুমি ?

আমায় চেয়ে তুমি পাওনি। দেখতে ইচ্ছে তো হতেই পারে!

ছিঃ! তাই বলে ?—মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল অচিন্ত্যর। অসম্ভব যন্ত্রণায় গলা বুজে এল। তবু তুড়ে ফুঁড়ে সে বলে উঠলো, হ্যাঁ। আমি গিয়েছিলাম মায়া। তুমি আমায় ইনসাল্ট করে বের করে দিলে তোমাদের বাড়ি থেকে। তারপর থেকে তুমি কি করছো—বাবা কি করছে—তা তুমিও জানো—আমিও জানি।

আমি একজন স্বাধীন মানুষ অচিন্ত্য। তোমার বাবাও সাবালক।

তুমি যে সাবালিকা তা আমি জানি। তোমায় সাবধান করতে গিয়েছিলাম মায়া—

ওয়ার্নিং দিতে ? বাড়ির পেছনে কুয়োতলায়!—যেখানে চান করি ? সেখানে!

না না মায়া। তুমি ইচ্ছে করে আমার কথা বাঁকা চোখে দেখছো। তোমার ভালোর জন্যে—

অচিন্ত্য কথা শেষ করতে পারলো না। মায়ার পাশে এসে দাঁড়ালো জীবনলাল। দাঁড়িয়েই চমকে উঠলো। তুমি ? তুমি এখানে ? তোমায় না থামারবাড়িতে আসতে বারণ করে দিলাম সেদিন।

অচিন্ত্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনলালের চোখে সরাসরি তাকালো। আমার কাজ ছিল তাই এসেছি।

কি কাজ ?

তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার বাবা—

কোনো কথা নেই তোমার সঙ্গে আমার।

বাবা! আমি একজন পলিটিকাল ওয়ার্কার। আমি তোমার ছেলে। দু'দিক দিয়েই তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা জরুরী।

থামো। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

বলা ভালো, ভোর রাত থেকেই বাতাসে আজ কিসের গন্ধ! দূরে গৈবীনাথের মন্দির দেখা যায় না। কিন্তু সুলতানগঞ্জ থেকে মন্দিরের ভোররাতের আরতির কাঁসর ঘণ্টা ভেসে আসছে। তেল কোম্পানীর হোর্ডিংয়ের লোহার খুঁটি শিশিরে ভিজে একশা। আরে! এখানে মই কিসের?

দাঁড়িয়ে গেল জীবনলাল। যা সন্দেহ হয়েছে তাই। মই বেয়ে কেউ উঠেছে—হোর্ডিং থেকে তার আইভরি রংয়ের ছবিটা—পোস্টার খুলে নিতে। কিংবা ঘষে তুলে দিতে।

বাঁ হাতে সাইড পকেটের ভেতর পিস্তলটা চেপে ধরলো জীবনলাল। কে উঠেছিস নেমে আয়—

যে উঠেছিল—সে যেন—জীবনলালের এই ক'টা কথার জন্যেই চুপ করে ওৎ পেতে বসেছিল। ওপর থেকে তার গলা দৈববাণী হলো—

এসে গ্যাছো। ভালোই হলো—

গলাটা চেনা লাগলো জীবনলালের। সে হাঁক দিল, নেমে আয় জটা—

বলাও শেষ—আর সড়সড় করে নেমে এসে জীবনলালের সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো—জেলার নামকরা জটা মস্তান। নামতে নামতেই তৈরি হয়ে নিয়েছে জটা। জীবনলাল কিছু বুঝে ওঠার আগেই—এমনকি পকেট থেকে পিস্তল বের করার ভাবনা তার মাথায় আসার আগেই—জটা তার ভোজালিখানা জীবনলালের কোমরের বেল্টের ওপর ঠেকিয়ে দিল। দিয়ে বলল, শার্টের ওপরেই তোমার বডি। ধরে লাও একটা মোটে পানপাতার আড়াল। তারপরেই তোমার নাইকুণ্ডলী। হ্যাণ্ডস আপ—বলে আচমকা চেঁচিয়ে থামলো জটা মস্তান। তার গলার মস্তানী অর্ডার ভোররাতের বাতাসে অনেকদূর অব্দি চলে গেল। এবার সে হেসে হেসে বলল, এ জেলা সদর তোমার বাবার সম্পত্তি! ফি বছর এখান থেকে দাঁড়াবে? যেখানে ইচ্ছে পোস্টার সাঁটাবে? ফ লস্ ভোটার বানিয়ে আসছো আজ তিরিশ বছর!

দাঁতে দাঁত চেপে জীবনলাল বলল, তুইও তো একসময় আমার হয়ে ভোটার করেছিস জটা।

ওসব পুরনো কথা আজ ভুলে যাও।—বলেই জীবনলালের পায়ে এক লাথি কষালো জটা। কষিয়ে নিয়ে বলল, দোস্তি তো তুমিই কেটে দিলে।

এবারও দাঁতে দাঁত চেপে জীবনলাল বলল, না কেটে উপায় ছিল! সুলতানগঞ্জের মার্ডারটা যখন করলি—তখন দেখলাম তোকে আর বলে রাখা ঠিক হবে না।

ওঃ! বড় রাখনেওয়ালা এসেছেন একজন! আমিও জানি অনেক কিছু। অমিয়বাবুর মেয়েটাকে নিয়ে ভোটের নামে খুব আশনাই হচ্ছে। কি?

মুখ ছিঁড়ে ফেলবো তোর জটা।

পরে ছিঁড়ো। এখন বাপের নাম জপ কর। তোমার সময় হয়েছে—

কথাও শেষ আর অমনি ডান হাঁটু ভাঁজ করে গদাম করে জটার দুই উরুর ফাঁকে বসিয়ে দিল জীবনলাল। জটারও বয়স কিছু কম নয়। এক সময় ছিল চাবুক। এখন সামান্য নড়ে চড়ে শিকার ধরে। ধরা হয়ে গেলে পোকা-মুখে টিকটিকি হয়ে ঝাপটি মেরে পড়ে থাকে। ও যে কেন নিজে পোস্টার ছিঁড়তে এলো? এসব কাজে তো যে কোনো একটা চেলা পাঠালেই চলে।

জীবনলালের নাভিতে ঠেকানো ভোজালি হাতেই জটা হোর্ডিংয়ের খুঁটির পায়ে গড়িয়ে পড়লো। চোখে কম দেখে? না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? ঠিক বুঝতে পারলো না জীবনলাল। আবছা অন্ধকারে সে জটার কপালে নল ঠেকিয়ে বলল, নে তাড়াতাড়ি উঠে আয়। দেরি হলে আলো ফুটে যাবে। তাড়াতাড়ি কর।

এই জীবনদা—তোমার পায়ে পড়ি—গুলি কোরো না।

পায়ে পড়ায় অনেক সময় পাবি। নে ওঠ। কথা দিচ্ছি গুলি করবো না।

সত্যি তো জীবনদা?

ভাখো। কেমন ছেলেমানুষের মতো করে! চল—ওই রেলপোলে যাবো। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ানো জটার পেছনে গিয়ে পিঠে নল ঠেকালো জীবনলাল।

অন্ধকার বড় রাস্তা এইভাবেই দু'জনে পার হলো। একজন দু'হাত উপরে তুলে। অন্যজনের এক হাত নলে। হাইওয়ে অক্ষয়কালীর মোড়ের কাছে উঁচু হতে হতে অন্তত সাততলা বাড়ির সমান। নিচে বড় রেলের লাইন। ব্রিজে দাঁড়িয়ে নিচের লম্বা লম্বা নারকেল গাছের মাথার তালু পরিষ্কার দেখা যায়! গাছের নিচেই মালগাড়ি সাইডিংয়ের বাফার। জায়গাটা দিনের বেলাতেও পরিষ্কার দেখা যায় না। বড় বড় ঘাসে ঢাকা থাকে।

জীবনলাল ব্রিজের রেলিংয়ে নিয়ে ঠেলে তুললো জটাকে। জটা দাঁড়িয়ে পড়লো। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল· পারবো না জীবনদা। এই শেষবারের

মতো ছেড়ে দাও। আর কখনো এদিকে আসবো না।

খুব পারবি। বুকে বল আন। তুই হলি গিয়ে জটা মস্তান। কত সাহসী বলে সবাই জানে। তারা শুনলে কী বলবে বলতো?

হাউ হাউ করো কেঁদে উঠলো। আমি বুঝেছি—তুমি কি চাইছো।

বেশ তো। তোর আপত্তি কোথায়?

আমি পারবো না জীবনদা—এবার ছেড়ে দাও।

আঃ? ভাখো দিকি—ছেলেমানুষের মতো কাঁদে। চল—নে ওঠ্—ভোর হয়ে আসছে।

জটা পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠলো। তাতে দৃকপাত না করে খুব ঠাণ্ডা গলায় জীবনলাল বলতে লাগলো—তুই ভেবেছিস তোর জন্যে আমি বুলেট খরচা করবো! নে ওঠ—বলতে বলতে জটাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে জীবনলাল রেলিংয়ের সবচাইতে ওপরের ফালিতে রাখলো। জায়গাটা সরু।

ভয়ে জটার কান্নাও শুকিয়ে গেছে। জীবনলাল সামান্য একটা ধাক্কা দিতেই ডাব পড়ার স্টাইলে জটা মস্তান নিচের রেললাইনের দিকে তলিয়ে যেতে লাগল। কয়েক পলক পরেই খুব নিচু থেকে উঠে আসা একটা মচকানো মতো চপ শব্দ শুনতে পেল জীবনলাল। জটার গলা আর সে শুনতে পেল না।

ফেরার পথে জীবনলালের মনে পড়লো, অনেকদিন আগে ঠিক এরকম সময় সে আর জটা মিলে কাকে যেন রেলিংয়ের ওপর থেকে অমন নিচে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই মনে পড়ায় বোধহয় জটা আগাম বুঝতে পেরেছিল। যাক্—এবার পোস্টার নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

বড় পার্টি শুধু হাতিই যোগাড় করেনি—সেই সঙ্গে যোগাড় করেছে হাতির সাজ। ছাতার চাঁদোয়া সমেত হাওদা। বার্ণপুর থেকে কোন সার্কাস পার্টি তাঁবু গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো—তাদের বারোটা হাতিই ভাড়া নিয়েছে বড় পার্টি। শুঁড়ের ওপর জরির কাজ করা কাপড় নামানো। মাথায় কিংখাবের মুকুট। মাহুতের পায়েও জরি বসানো জুতো। মাথার ওপর ছাতার চাঁদোয়া। বেশির ভাগ হাওদাই ফাঁকা। শুধু একটিতে বড় পার্টির ক্যাণ্ডিডেট ব্রজ মিত্তির বসে। যেন ভোটে জেতার পর ভোটারদের দেখা দিতে বেরিয়েছে।

এই ব্রজ ছিল জীবনলালের নিজের হাতে রিক্রুট করা ওয়ার্কার। স্বাধীনতার আগে। ব্রজ তখন স্কুলের উঁচু ক্লাশে। হাওদায় ঠেস দিয়ে বসা ব্রজকে দেখে এসব মনে হচ্ছিলো জীবনলালের।

আসলে এক ডজন হাতি নিয়ে এমন এলাহি মিছিল দেখে জীবনলালের মনটা খুব ভেঙে পড়লো। সারা শহর ভেঙে পড়েছে। একেবারের শেষের হাতিতে ভাড়া করা সানাই। আকাশ বাতাস জুড়ে জয়ের গন্ধ যেন। তবে কি ওরা জিতে যাবে?

এইসব ভাবছিল—আর পার্টি অফিসের দোতলার ঘরে বসে জানলা দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিলো জীবনলাল। শীতের বেলা দশটা। শহরটাই ভেঙে পড়েছে হাতির পায়ে।

একজন বলল, পটকা ফাটাই জীবনদা। হাতির পাল নাহলে এলোমেলো হয়ে যাবে।

দূর বোকা! তাতে স্ট্যামপিড হবে। দেখতে আসা মানুষ মারা পড়বে অনেক।

ওদের ঘাড়ে দোষ পড়বে তাহলে জীবনদা।

এই বুদ্ধি নিয়ে পলিটিকস্ করতে এসেছো! সব দোষ তখন পাবলিক আমাদের ঘাড়েই চাপাবে। তার চেয়ে বিকেলে ডাকবাংলোর মোড়ে পাবলিক মিটিংটা যাতে সাকসেসফুল হয় তাই কর।

লোকসভার কন্সটিটুয়েন্সি বিরাট। হাতির শোভাযাত্রা তখন সুলতানগঞ্জ ছাড়িয়ে বুলবুলচণ্ডীর পথ ধরলো—তখন সদর শহরে ডাকবাংলোর মাঠে হ্যালো মাইক টেস্টিং—হ্যালো মাইক টেস্টিং শুরু হয়ে গেছে। জীবনলাল হাত ঘড়িতে দেখলো—পৌনে চারটে।

ডেকরেটর মঞ্চ বানিয়ে রেখে গেছে সকাল সকাল। দিল্লি থেকে অল ইণ্ডিয়া নেতা যোশীজিও এসেছেন খানিক আগে। ধানবাদে এসেছিলেন আরেকটা বাই ইলেকশন দেখে যেতে। সেখান থেকেই বাই রোডে চলে আসা এখানে। মঞ্চে ওঠার আগে জানতে চাইলেন তিনি, ইতনা সান্নাটা কিউ? ক্রাউড কাঁহা জীবন?

হিন্দি বাতচিতের রাস্তা ধরেই জীবনলাল বলল, পরিস্থিতি ইস প্রকার হ্যায় যোশীজি—কিউ আজহি হাঁতি লেকর বহোৎ ভারি জলুস উনলোগোনে নিকালা—

জীবনলাল কথা বলছিল আর সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠছিল। তার আগে

যোশীজি। পেছনে মায়া। তার পেছনে সদর বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রাণবল্লভবাবু। তিনিই সভাপতিত্ব করবেন।

প্রাণবল্লভেরই চোখে পড়লো প্রথম। তিনি ফিসফিস করে বললেন দেখেছেন জীবনদা?

হুঁ। বলে চুপ করলো জীবনলাল। তার চোখ এড়ায়নি। ডাক বাংলোর মাঠে এফ সি আইয়ের গোডাউনের বড় দেওয়ালের দু'লাইনে বড় করে লেখা—

জীবনে কত মায়া

বন্ধু মায়াই জীবন

সভায় যে আসছে সে-ই কি বিড়বিড় করে লেখা দুটির লাইন একবার পড়ছে আর ফিকফিক করে হাসছে। পাশেই চেয়ারে চশমা চোখে মায়া বসে। তার মুখ না দেখেই জীবনলাল আন্দাজ করলো—রাগে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠেছে ওর।

এর ভেতর চাপা গলায় জীবনলাল দাঁত চেপে বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখো প্রাণবল্লভ। এটা পাবলিক মিটিং। চটলে চলবে না—

ইলেকট্রিকের লোক মাইক ঠিক করছিল। উদ্বোধন সঙ্গীত হবে। মালাও রেডি। চারজনের গলায় চারটি মালা পরাবার জন্যে চারটি ছোট ছোট মেয়ে ঠোঁটে আলতা দিয়ে মঞ্চের ব্যাকস্টেজে দাঁড়িয়ে।

যোশীজি বললেন, উন্‌লোগ হাঁতি কা জোলস নিকালা। ঠিক হ্যায়। আপ লোগ ঘোড়সওয়ারকা মিছিল কর দিজিয়ে। ফাওস নো প্রবলেম—

জীবনলাল দেখছিল মাঠের ছ'আনা ভর্তি হয়েছে। সেহারাবাজার থেকে লোক আনার জন্যে তিনখানা লরি গেছে দশটায়। তারা এখনো আসছে না কেন? যোশীজির কথায় 'ফাণ্ড' কথাটা শুনতে পেয়ে প্রায় লুফে নিয়ে কি বলতে যাবে—ঠিক এমন সময়—বলা যায় একেবারে মোক্ষম সময়—

বসে থাকা লোকজনের ভিড় চিরে ক'জন স্লোগান দিতে দিতে ঢুকছে। তাদের কাঁধে স্ট্রেচার।

মুহূর্তে সভা লণ্ডভণ্ড। বসা লোকজন উঠে দাঁড়ালো। স্ট্রেচারে শোয়া লোকটার মাথায় দেদার জটা। যেজন্যে সবাই ওকে জটা মস্তান বলেই ডাকে—সেই জটাকে তুলে এখানে নিয়ে আসছে? জটা তো—সঙ্গে সঙ্গে ঘচাং করে আজকের ভোর রাতটা মনে পড়ে গেল জীবনলালের।

সবার আগে জীবনলাল উঠে দাঁড়ালো। মাইক ধরে ঠাণ্ডা গলায় পরিষ্কার

উচ্চারণে জীবনলাল বলে যাচ্ছে—স্ট্রেচার সমেত সেই চারজন ততক্ষণে মঞ্চের কাছে এসে গেছে।

আজ আমরা এখানে সভা করতে পারছি না। পায়ের জোরে আমাদের সভা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে—তৈরি হয়েই কাল আমরা এখানেই সভা করবো। কে ভাঙতে পারে দেখবো কাল—

কথা শেষ করতে পারলো না জীবনলাল। মঞ্চে ইট পড়ছে। সোশীজিকে নিয়ে প্রাণবল্লভ তার জিপে উঠেই স্টার্ট দিল।

মায়া তড়িঘড়ি গিয়ে অ্যামবাসাডরে বসে দরজা খুলে ধরলো। জীবনলাল ছুটে এসে বলল, দোর বন্ধ কর।—বলেই সে মাথা বাঁচিয়ে ড্রাইভারের সিটে এসে বসেই স্টার্ট নিল।

এখন শীত আর অন্ধকার বিকেল হলেই চলে আসতে চায়। জীবনলাল খামারবাড়ির বড় ঘরের ইজিচেয়ারে নিজে বসে। আর উল্টোদিকের বড় আয়নায় মুখোমুখি বেতের কোলে ধরা চেয়ারটায় মায়া। আয়না দেখে সে মাথার অগোছালো চুল ঠিক করছিল। বাইরে পাকা ধানের হলুদ মাঠের গায়ে কালো রঙের বড়সড় একটা পোকার মতো অ্যামবাসাডরটা দাঁড় করানো।

ইজিচেয়ারে এলিয়ে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই জীবনলাল বলল, আজ ভোর রাত থেকেই বাতাসে কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম—

মায়া কোনো জবাব দিল না। বাইরে জানলায় বিকেল ঝুলে পড়ছিল। বেশ খানিক পরে মায়া বলল, তুমি বলে পলিটিকস্ বোঝো।

অসহায় চোখে মাথা তুলে তাকালো জীবনলাল। কিছু বুঝতে পারছি না মায়া। এটা আমার হোম কন্সটিটুয়েন্সি। এখানে পাবলিক এত হসটাইল হবে কেন?

হয়ত আমিই—

বাজে কথা। আমি লড়বো। হুলিগানদের আমি চিট করবো। পলিটিক্যালিই চিট করবো।

বারান্দায় তালা দিয়েছো?

অত সাহস হবে না ওদের মায়া। তবু এই মাত্র ঢাকা বারান্দায় কোলা-

পসিবলে ফেলু গিয়ে তালা দিয়ে এল। চা খাবে?

না। গাড়িটা বাইরে। যদি পুড়িয়ে দেয়।

সে সাহস হবে না। আমি আর ফেলু—দুজনে দুটো বন্দুক ধরবো।

ফেলু জানে?

ওর ছোটবেলায় তো ওকে শিখিয়েছিলাম। তাছাড়া—

এখন সবকথাই ইম্পর্টাণ্ট মনে হচ্ছে মায়ার। সে জানতে চাইলো, কি?

ভাড়ার গাড়ি ইনসিওর করা থাকে!

ওঃ!

ঠিক তখনি বন্ধ কোলাপসিবল গেট ঝনঝন করে উঠলো। কে ধাক্কাচ্ছে। মায়া উঠে এসে দাঁড়ানো জীবনলালের গায়ে লেগে গেল। তুমি বাইরে বেরোবে না—

আঃ! দাঁড়াও। আলোটা জ্বেলে দিই।

মায়াকে ছাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়েই জীবনলাল চেঁচিয়ে উঠলো—ফেলু—ও ফেলু—দরজাটা খুলে দে—দেখে খুলবি—

মায়া প্রায় সিঁটিয়ে দাঁড়ানো। তার দিকে তাকিয়ে খোলাখুলি হাসলো জীবনলাল। তারপর বলল, তুমি খাটে এসে বস।

তুমি?

আমি বন্দুকে টোটা ভরবো। গা-জোয়ারি গায়ের জোর দিয়েই ভাঙতে হয়।

ফেলু ছুটে ফিরে এল। বাবু। বড়দা এয়েছে—

কি একবার ভাবল জীবনলাল। তারপর মায়ার চোখে তাকিয়ে বলল, খুলে দে।

প্রায় গলা চিরে জানতে চাইলো মায়া, এখানে আসবে?

হ্যাঁ। আসবে। আমার ছেলে।

ততক্ষণে ফেলু দরজা খুলে অচিন্ত্যকে ভেতরে এনে আবার গেটে বড় তালা ঝুলিয়েছে। এই ঠাণ্ডার দিনেও বড়সড় ফেলুর পরনে একটি হাফপ্যাণ্ট। প্যাণ্টের বাইরে লোমে ঢাকা পুরুষের বিশাল দুই পা। ওপরে একটা বড় খাকির হাফশার্ট। বোঝাই যায়—জীবনলাল বা বড়সড় সাইজের কোনো লোকের ব্যবহার করা বাতিল শার্ট। মুখময় দাড়ি আর মাথাভর্তি ঠাসা কালো চুল ঝাঁকিয়ে ফেলু অনুগত কোনো দামড়া কাজের লোকের মতোই লাফাতে লাফাতে জীবনলালকে বলল, বাবু—বড়দা এসে গেল—

সেদিকে না তাকিয়ে জীবনলাল অচিন্ত্যর মুখে তাকালো। অচিন্ত্যর গায়ে একটা হাতা-গোটানো শার্ট। বুকের ওপর সস্তার র‍্যাপার। পায়ে সামান্য স্যাণ্ডেল। মালকোচা ধুতি। তারও দাড়ি ফেলুর মতোই অবিন্যস্ত।

তুমি এখন আসবে আমি জানতাম। আমি গর্তে কতটা পড়েছি—তা তুমি দেখতে ভালবাস চিনু—

অচিন্ত্য ও কথায় না গিয়ে একবার মায়ার চোখে মুখে তাকালো। রীতি-মতো আতঙ্কে মায়া একেবারে খাটের কাছে গিয়ে দু হাতে বাজু চেপে ধরেছে। হয়তো কাঁপছে। অচিন্ত্য বলল, তুমি জটা মস্তানকে রেলপোল থেকে ফেলে দিয়েছিলে ?

হুঁ। বেঁচে ফিরে আসবে ভাবতে পারিনি।

নিচে ত্রিপলের ওয়াগনে পড়ে গিয়ে ফিরে এসেছে। খুবই উণ্ডেড। বেঁচে যাবে হয়তো।

আমি না ফেললে—ওই আমার পেটে ভোজালি বসাতো। রাজনীতিতে তো এসব থাকেই। তুমি চিন্তিত ?

চিন্তিত ? না। কিন্তু তোমার সভা ভেঙে দেবার পর ওরা আধমরা জটাকে নিয়ে মিছিল বের করেছে।

ওদের হয়ে সে মিছিলের সামিল হয়ে তুমি কটা স্লোগান দিয়ে এলে পারতে !

না। তার দরকার নেই। আমি মিছিল থামিয়ে জটাকে হাসপাতাল এমারজেন্সিতে ঢুকিয়েছি। আগে তো লোকটা বাঁচুক। কিন্তু ওরা তো মিছিল করে আসবেই বাবা—

এলে দেখা যাবে। আমি তো তৈরি। ফেলু আছে। ফেলু একটা বন্দুক ধরবে। আর আমি একটা। তার আগে থামারবাড়ির সব কটা আলো ভেঙে দিয়ে অন্ধকার করে নেব। কিরে ফেলু—পারবি না ?

খুব পারবো বাবু।

হঠাৎ কি হলো অচিন্ত্যর। সে চটাস করে ফেলুর গালে এক চড় কষালো। বাবু কি ? বাবু ?—এ লোকটা তোমার বাবা ফেলুদা—

ফেলু চমকে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার চেয়েও বেশি চমকে মায়া দেখলো—ময়লা শাড়ি পরা সেই মহিলা কখন সবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শান্ত গলায় সে ডাকলো, আয় ফেলু চলে আয়। আয় বলছি—

অচিন্ত্য সবার সামনে গিয়ে সেই মহিলার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে

তাকে জীবনলালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। এই হচ্ছেন আমাদের প্রথম মা—

জীবনলাল কথা বলবে কি। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একবার মহিলার দিকে তাকালো—আরেকবার ফেলুর দিকে।

ফেলু একদম জবুথবু হয়ে গেছে। অচিন্ত্য তাকে ডাকছে ফেলুদা বলে। আবার বাবুকে বলছে—তার বাবা। সব গুলিয়ে যাচ্ছে ফেলুর।

অচিন্ত্য হাসতে হাসতে ফেলুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল—

—মুণ্ডু চাই।

—মুণ্ডু চাই॥

অচিন্ত্য যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই বলল, না এখন তোমার যাওয়া হবে না মায়া। এখন তোমায় একা অন্ধকারে পেলে ওরা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে মিছিলের সব।

অচিন্ত্যর কথা শেষ হতে না হতে খামারবাড়ির হাতায় মিছিল ঢুকে পড়লো। কত লোক—অন্ধকারে আন্দাজ পাবার উপায় নেই। জীবনলাল অভ্যাস-বশেই বন্দুকের নল ওপরে তুলে ঘরের আলোর ডুমটা ভাঙতে গেল।

উঁহু। বলে অচিন্ত্য এগিয়ে এল। তা হবে না বাবা।

মিছিলে স্লোগান—মুণ্ডু চাই—মুণ্ডু চাই। মুণ্ডু—

এই গোলমালের ভেতর নিজের ছেলের কাছে নিজেরই খামারবাড়ির আলো নিভিয়ে দিতে গিয়ে বাধা পেয়ে চমকে দাঁড়ালো জীবনলাল। যুদ্ধের নিয়মে—সে জানে—এক্ষুনি সব আলো ভেঙে দিয়ে অন্ধকার করে দিতে হবে সারাটা খামারবাড়ি। তারপর তো দু দুটো দোনলা আছেই। এ মিছিল ছত্রাকার করে দিতে কয়েকবার বারান্দায় গিয়ে—আর জানলায় দাঁড়িয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলেই চলবে। তখন মুণ্ডু চাইওয়ালারা অন্ধকারেই এলোপাথাড়ি ছুটে আছাড় খাবে—পা ভাঙবে—মাথা ফাটবে। প্ল্যানটা তাই ভেবে রেখে-ছিল জীবনলাল।

বন্দুকের নল নামিয়ে অচিন্ত্যর দিকে তাগ করলো জীবনলাল। কি চাও তুমি? সরে যাও আমার সামনে থেকে। এখন নষ্ট করার মতো সময় নেই—

না বাবা। আলো ভেঙে অন্ধকার করতে পারবে না।

তার মানে? সরে যাও বলছি—

না বাবা—আমি সরবো না। ফেলুদার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তুমিই গিয়ে গেট খুলে দেবে।

তার মানে—তুমি চাও—ওরা আমায় পেয়ে ছিঁড়ে খাক। আমার বডি পেয়ে পায়ে মাড়াক। সেটি হচ্ছে না কিছুতেই চিনু।

সেসব কিছুই হবে না বাবা। আমি তোমার পাশে থাকবো। তুমি এ জেলার পুরনো লিডার। মাস ক্যাপাতে—মাস থামাতে—দুইই জানো তুমি। তুমি বলবে—জটা তোমায় ভোজালি দিয়ে শেষ করে দিচ্ছিল বলেই—তুমি না বাবা এ জেলার সেরা স্পীকার—

জীবনলাল চুপ করে সব শুনলো। নিজের ছেলের চোখে তাকিয়ে থাকলো খানিক। ঘর থমথমে। আর গেটের বাইরে দাঁড়ানো মিছিলের শ্লোগানে ঢাকা বারান্দা ফেটে যাবার যোগাড়।

বেশ। বলে ক' পা এগিয়ে গেল জীবনলাল। হাতের বন্দুকটা খাটে ছুঁড়ে দিয়ে আরেক ছেলের দিকে হাত বড়ালো। দে—চাবিটা দে—

অচিন্ত্য এগিয়ে জীবনলালের ঠিক পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো। রাগ কোরো না। এ বাড়ির বড়দাদা—তুমি। আমি নই।

মায়া বড় চোখে জীবনলালের চোখে তাকালো। জীবনলাল চোখ সরালো না। শীতের মলিন সন্ধ্যা। ভোলটেজ কম বলে ইলেকট্রিক আলো কেমন যেন মরা মরা। অথচ এই মাত্র অচিন্ত্য এ ঘরে পরপর দুটি বোমা ফাটিয়েছে।

একটি বোমা: ওই ময়লা মলিন মহিলা জীবনলালের প্রথম বউ।

দ্বিতীয় বোমা: পাগলা ফেলু জীবনলালের বড় ছেলে।

মায়া তীরের মতো ছুটে বারান্দায় পড়লো। আমি বাড়ি যাবো। গেট খুলতে বল।

জীবনলাল কিছু বলল না। বাইরে অন্ধকার ফুঁড়ে ধেয়ে আসা মিছিলের শ্লোগানের টুকরো কানে আসছে।